মা যে আমার সর্ব্বরূপে

মা যে আমার সর্ব্বরূপে

ব্রহ্মচারিণী জয়া ভট্টাচার্য্য, বেদান্তাচার্য্যা

প্রকাশক ঃ
শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী কন্যাপীঠ
ভাদাইনী, বারাণসী-২২১০০১

মূল্য ঃ পঁ Rs 50 00

প্রথম প্রকাশ ঃ
শরদ্ নবরাত্রি
অক্টোবর, ১৯৮৮

মুদ্রক ঃ
প্রোগ্রেসিভ প্রিন্টর্স
বি০ ১/২৪৮ অসি, বারাণসী।

রত্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
কামাচ্ছা, বারাণসী।

বিষয় সূচী

ভূমিকা

মা আমাদের আনন্দময়ী। মায়ের কথা লিখলে এবং আলোচনা করলে মনে আনন্দ হয়। প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ের নিবিড়তম তন্ত্রী আনন্দ দিয়ে গড়া। প্রত্যেকের মধ্যে একটি পূর্ণ প্রস্ফুট নিত্যবস্তু বিদ্যমান। সেই তার স্বভাব, স্বরূপ, সেই সচ্চিদানন্দ। সচ্চিদানন্দময়ী মায়ের চরণে আত্মনিবেদন করা মাত্র সেই নিত্যস্বরূপ, সেই পূর্ণ স্বভাব জেগে ওঠে। মায়ের আনন্দস্বরূপ ধ্যান করা মাত্র মনের তন্ত্রীতে আনন্দের হিল্লোল বয়ে যায়। যে আনন্দ সম্বন্ধে শ্রুতি বলেছেন, 'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।' মা সেই আনন্দের ঘনীভূত বিগ্রহ। মা নিজে বলেছেন, "জীব স্বভাবতঃই আনন্দ চায়। তার ভিতরে এই আনন্দ আছে বলেই তো তা চাইতে পারে। তা না হলে সে তো চাইত না। সে আনন্দ না চেয়ে থাকতে পারে না। লক্ষ্য করলে এই আনন্দ ও শান্তির আকাঙ্ক্ষা সমস্ত জীবের মধ্যে দেখতে পাবে। পোকা-মাকড় প্রভৃতি ক্ষুদ্র প্রাণীও তাপের দিকে যেতে চায় না। তারা চায় শান্তি, সুরক্ষা ও আরাম। রৌদ্রে তাপিত হয়ে জীবজন্তু চায় ছায়া আর সুশীতল জল। মানুষও সেইরূপ ত্রিতাপ জ্বালায় তাপিত হ'য়ে শান্তির স্থল, আনন্দের আকর শ্রীভগবানকে খোঁজে।"

আনন্দের স্বাভাবিক টানেই আমরা মায়ের কাছে ছুটে এসেছি, কিন্তু মা যে আসলে কী তা' জানার বা ভাষায় ব্যক্ত করার সাধ্য আমাদের নেই। "তোমরা যে যা ভাবো, আমি তাই"—মায়ের এই কথার মধ্যেই তাঁর প্রকৃত পরিচয়ের আভাস পাই। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌ গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন, "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।" "যে যেমন ভাবে আমার কাছে আসে, আমি তাকে সেই

ভাবেই আপ্যায়িত করি।" মায়ের অনন্য ভক্ত ভাইজী যখন জানতে চেয়েছিলেন মা সত্যসত্যই কী, তার উত্তরে মা বলেছিলেন, "আমি আগেও যা, এখনো তা, পরেও তা। তোমরা যখন যে যা বলো, যে যা ভাবো, আমি তাই। তবে ইহা খাঁটি যে এ শরীরের জন্ম প্রারব্ধ ভোগের জন্য হয় নাই। তোমরা মনে করো না কেন, এ শরীর একটি ভাবের পুতুল, তোমরা চেয়েছো, তাই পেয়েছো। এখন একে নিয়ে সাময়িক খেলা করে যাও, বেশী ভেবে কী হবে ?"

ভাবমূর্তিরূপিণী মা ! আমরা তাঁকে যেমন চেয়েছি তেমনি পেয়েছি। তাঁকে নিয়ে নানা খেলা খেলেছি। কতবার দেখেছি, মা যখন যে বাণী উচ্চারিত করেছেন, তাই পরমুহূর্তে বাস্তবের আকার নিয়েছে—ভাবজগৎ থেকে নেমে এসেছে বস্তু-জগতে। মহাশক্তির যে ভাবতরঙ্গ সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের অনাদি কারণ, তাই মায়ের "খেয়াল" রূপে প্রকাশিত। ভবভূতি বলেছেন," বাচমর্থোঽনুধাবতি।" মহাপুরুষগণের উচ্চারিত প্রতিটি শব্দই অর্থপূর্ণ ও বাস্তবায়িত হয়, তাঁদের বাণীর পিছনে অর্থ ধাবিত হয়, কথার বিষয়বস্তু ভাব থেকে বাস্তবে নেমে আসে। মহাপুরুষ যদি জলকে দেখিয়ে বলেন, 'এতো দুধ', তাহলে জলও তার জলস্বরূপ ছেড়ে দুধ হয়ে ওঠে।

মাকে যতোটুকু আমরা কাছে পেয়েছি, শুধু খেলাই করেছি তাঁর সঙ্গে। মা সাহস দিয়েছেন, অভয় দিয়েছেন, তাই তাঁর লীলাখেলায় আনন্দে যোগ দিয়েছি। কখনও মায়ের বিরাট গাম্ভীর্যপূর্ণ রূপের সামনে ভয়ে পিছিয়েছি, আবার কখনও মায়ের সঙ্গে মিত্রের মতন ব্যবহার করেছি। মায়ের সঙ্গে তর্কও করেছি। আবার হাসিঠাট্টাও করেছি। কখনও মা হয়তো কোনো মজার কথা বললেন এবং আমাদের তা' নকল করেও দেখালেন। তখন আমরা মায়ের সঙ্গে সমান-সমান ব্যবহার করলাম। মা যে কতো বড়ো, সে কথা মনেও এলো না। মনে এলে যে মায়ের স্নেহলীলা ভেঙ্গে যাবে। মায়ের অনন্যা সেবিকা

গুরুপ্রিয়াদিদি বলেছিলেন, "তোরা আগুন নিয়ে খেলছিস্, মনে রাখিস্।"

মাকে বুঝি বা জানি, এমন শক্তি আমাদের নেই। মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ মহাশয় মায়ের জগজ্জননী আদ্যাশক্তি স্বরূপ সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত করেছেন, সেই মহাশক্তির ধারণাই তো আমাদের নেই। মা তাঁর অখণ্ড লীলা খণ্ড ও সীমার মধ্যে যে ভাবে প্রকাশ করেছেন, তার যে কত শোভা ও মাধুর্য্য, তার বর্ণনা করি, সে সাধ্য আমাদের কোথায়? মাকে যখন জগজ্জননীরূপে বর্ণনা করা হয়, তখন তিনি জগজ্জননী আদ্যাশক্তিই। এই বিরাট ও অনন্ত বিশ্বের তিনি যেমন একদিকে আধার, আবার অন্যদিকে এর আদিকারণও তিনি স্বয়ং। নিজ স্বাতন্ত্র্য-লীলায় তিনি এক থেকেও নানা সেজেছেন। মাকে আমরা আলাদা-আলাদারূপে—এক থেকে অন্যকে পৃথক্‌ভাবে দেখি, তা যে বস্তুতঃ তা নয়, সে কথা আমরা ভুলে যাই। যা আছে, হবে বা হয়েছিল, সবই তাঁরই রূপ, একথা আমরা মনে রাখি না। মনে রাখতে পারিনা এবং আমাদের অনুভবেও তা আসে না বলেই আমরা বদ্ধজীব। কিন্তু জীবন্মুক্তের দৃষ্টিতে সবই তিনি—যাঁকে আমরা চিদ্রূপিণী পরমেশ্বরী বলি, সবই তিনি। মায়ার আবরণ আছে বলে এই সত্য প্রতিভাত হয় না।

মাকে যিনি দেখতে জানেন তিনি বলতে পারেন মা বাস্তবিক কী। আমাদের কাছে মা শুধু মা-ই, অন্য কিছু নয়। আমাদের সব ভাবনায়, পূজায়, অর্চনায়, আমাদের সব দেখায় যাতে সব জায়গায় মাকে দেখতে পারার অভ্যাস করতে পারি, তাই যেন মা আমাদের হাতে ধরে সেই শিক্ষাই দিয়েছেন। আমরা যখন দুর্গা, কালী, শিব, বিষ্ণু, লক্ষ্মীকে পূজা করি, তখন আমরা সেই—সেই আধারে, সে সব বিগ্রহকে লক্ষ্য করে মাকেই পূজা করি। আমাদের সব দর্শন মায়ের প্রত্যক্ষ দর্শনে যেন পর্যবসিত হয়। এই জন্যই মা নানা লীলা ও খেলার মাধ্যমে আমাদের সে সব শেখাতেন।

মাকে অসংখ্য ভক্ত দর্শন করতেন। তাঁরা যে সকলেই একটা বিশেষ ভাব নিয়ে আসতেন, তা নয়। তবে মানুষমাত্রই একটা ভাব নিয়ে আছে। সে ভাব লৌকিক হতে পারে, আবার অপ্রাকৃত ভাবও যে তাতে থাকতে পারে না, তা নয়। কেউ হয়ত শুধু কৌতূহল নিয়ে মাকে দর্শন করতে এসেছেন। এসে দেখলেন, এতকাল বাইরে থেকে মায়ের কথা যে-ভাবে তিনি শুনেছেন, মা ঠিক তা নয়। তিনি দেখলেন মা যেন সর্বশুক্লা সরস্বতী মূর্তিতে বিরাজমানা, স্বয়ং পরাবিদ্যা রূপ পরিগ্রহ করে রয়েছেন। তাঁর অনন্ত জ্ঞান যেন একটি দুটি কথায় প্রকাশ পাচ্ছে। আবার যাঁর হৃদয়ে মাতৃভাব প্রবল, তিনি দেখলেন মা শুধু মা-ই। যে মা কোন একটি ব্যক্তির নয়, সমগ্র বিশ্বের মা তিনি। তাঁর দৃষ্টিতে শান্তি, বাণীতে পরম আশ্বাস, ভয় সেখানে সুদূর পরাহত। মার সেই স্বরূপ যার কাছে প্রকাশিত, সে তখন একটি মা-নির্ভর শিশু মাত্র। আবার যাঁরা একের মধ্যে নানাকে দেখতে চান, তাঁদের কাছে চঞ্চল জলতরঙ্গে অনন্ত চন্দ্রখণ্ডের মত মা নানারূপে নানাভাবে প্রকাশিত।

মার অনন্ত ভাব ও লীলায় যে যে ভাব মার পরমকৃপায় ভিন্ন ভিন্ন ভক্তের নিকট প্রকাশ পেয়েছে, সে সব ভাব তাদের স্বকীয় হয়েও মায়ের স্বল্পকালের দর্শনে সেই ভাবের উদ্বোধন ঘটেছে। তাই তাদের কাছে মা সেই সেই ভাবের বিষয়রূপে প্রকাশ পেয়েছেন। তাই কোন একটি ভাবও মার ভাব নয়, একথা বলা যায় না।

এখানে আমরা ভাব বলতে যা বোঝাতে চাই, তা কিন্তু ভাবুকের অসাধারণ ধর্ম। ভাব নিয়ে আমরা যে সব কথা সাধারণতঃ বলি, তা কিন্তু সত্যকারের ভাব নয়—তা হল ভাবের অভিনয় মাত্র। তবে অভিনয়ও যদি যথার্থ হয়, তবে তাও রসে পর্য্যবসিত হয়।

শ্রীচৈতন্যদেব যে মহাভাবময়ী রাধার স্বরূপকে আয়ত্ত করেছিলেন, বহু সাধক ও রসিক খণ্ড খণ্ড ভাব নিয়ে যে মহাভাবে উন্নীত হতে প্রয়াসী হন, আসল ভাব হল সেই ভাব। প্রত্যেক জীবেই নিজ নিজ

স্বভাব অনুসারে একটা না একটা ভাব বর্তমান। কারো মধ্যে ভাবটি পুষ্ট, আবার কারো মধ্যে পুষ্টি আসতে বিলম্ব আছে। যার মধ্যে ভাবের পুষ্টি হয়েছে, সে তার ভাবের বিষয়কে সেই রূপেই দেখে। সে যদি বৃদ্ধও হয় তা হলেও তার ভাব শরীর—পাঁচ বছরের শিশু হতে পারে, অথবা ষোড়শ বর্ষীয় কিশোরও হতে পারে। তার কাছে ভাবের বিষয়টি তার ভাবের অনুকুল মাতৃরূপে, কিংবা কন্যারূপে, নর্ম সুহৃদরূপে, আবার নিজের ইষ্ট রূপেও প্রকাশ পেতে পারে। যখন কোনো ভাবুকের কাছে অর্থাৎ যিনি সত্য সত্যই ভাবের স্তরে আরূঢ়, তাঁর কাছে মা তাঁর কন্যা-রূপে অথবা জননীরূপে বর্তমান, তখন মায়ের আর কোন রূপ নেই। অন্য অসংখ্য অনন্ত রূপ তখন তিরোহিত। আবার যদি সে ভাগ্যবান্ ভাবুকটি মহাভাবের সামান্য স্পর্শও পেয়ে থাকেন, তাহলে মায়ের এক স্বরূপেই তিনি অনন্ত ভাবের খেলা দেখতে পারেন। মা যে স্বরূপতঃ এক হয়েও অনন্ত, এই সত্য বোঝাবার জন্যই মনে হয় মা আমাদের ভাবের খেলার কথা বলেছেন এবং ভাবের খেলা খেলেছেন। মাকে নিয়ে খেলে চলার খেলাই হয়ত একদিন অকস্মাৎ আমাদের স্বরূপে ভাবের জাগরণ ঘটাবে এবং এই জাগরণের মাধ্যমে আমরা ভাব থেকে রসে উপনীত হতে পারব। রসই তো তার স্বরূপ—"রসো বৈ সঃ।" রসরূপেই সব কিছুর পরিসমাপ্তি।

মা স্বয়ং প্রকাশ। যাঁর প্রকাশে অখিল ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত। তাঁর পরিচয় কে প্রকাশ করবে? যিনি মনের মনন শক্তি, জিহ্বার বাচনশক্তি পরাবাক্-স্বরূপা, তাঁকে মন অথবা বাণীর আয়ত্তে আনা সম্ভব নয়। তথাপি যেমন সূর্যরশ্মি মেঘসমূহে বিকীর্ণ হয়ে বহু বর্ণ প্রকাশ করে, তেমনি মা মহাকরুণাবশে অথবা লীলারসে বিভিন্ন প্রসঙ্গে আত্মপরিচয়াত্মক যে সকল ইঙ্গিত দিয়েছেন, তা আমাদের চিরকালের ধ্যানধারণার বিষয়। সে সব সূত্র ধরে যদি যৎসামান্যও মায়ের মহিমা উপলব্ধি করতে পারা যায়, আমাদের জীবন ধন্য হবে।

মা একাধারে পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ ও পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণী। যে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ তত্ত্ব প্রস্থানত্রয়ীর প্রতিপাদ্য বিষয়, যাঁর নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে বেদমন্ত্রের উৎভব, মা সেই পরব্রহ্মা, পরাশক্তি। এই মোহময় সংসারে মায়ের জন্ম হয়নি (মা'র গূঢ় ভাষায় "জ—ন—মে"), হ'য়েছিল চাক্ষুষ আবির্ভাব মনুষ্যলোকের মহাসৌভাগ্যক্ষণে। আবির্ভাবের ক্ষণ থেকেই মা পূর্ণ চৈতন্যরূপে প্রকাশিতা। সেই অনন্ত প্রকাশকে হৃদয়ে ধারণ করার এই ক্ষীণ চেষ্টা। আমাদের পাথেয় মা'র আশ্বাস বাণী—"ভয় কী? মা তো আছেন।"

শ্রীশ্রীমায়ের খেয়ালেই একদিন এই দিনলিপি লেখার সূত্রপাত হয়। মা আমাদের, অর্থাৎ কন্যাপীঠের কন্যাদের বলতেন সারাদিনের আপন-আপন ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্বন্ধে লিখে রাখতে, যাতে আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মসংশোধনের পথ সুগম হয়। মায়ের নির্দেশমত ডায়েরী লেখা শুরু হল। হয়ত প্রতিদিন লেখা হত না, মাঝে-মাঝে বাদ পড়ত। কিন্তু মা বলেছিলেন নিয়ম করে লিখতে—বাদ দিলে চলবে কেন? অবশেষে ১৯৭৪ সাল থেকে মোটামুটি নিয়মিত ভাবে ডায়েরী লিখতে শুরু করলাম। যখন মা কাছে থাকতেন, কত উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটত একের পর এক। কখনও সবিস্তারে, কখনও সংক্ষেপে লেখা হত। লৌকিক দৃষ্টিতে মা দূরে থাকলে স্বাভাবিক ভাবেই মায়ের কথা ডায়েরীতে কম থাকত। নিজের ভুল-ত্রুটি এবং নিত্যকার উল্লেখনীয় কাজের কথা কিছু কিছু থাকত। কিন্তু শুধু নিজের কথা লিখে মন কিছুতেই ভরত না। ভাবলাম, যদি দিনলিপি লিখতেই হয়, তাতে মায়ের কথাই লিখব, এবং প্রসঙ্গতঃ আর যা কিছু এসে যায়! ভেবে দেখলাম, মায়ের অনুধ্যান যদি এই ডায়েরীর মাধ্যমে করি, তাহলে লৌকিক জীবন ক্রমশঃ পরমার্থের পথে একটু-একটু করে অগ্রসর হবে। আমাদের জীবন তো খুব বেশী কর্মবহুল নয়। মাকে নিয়েই আমাদের জীবন। মায়ের কথা, মায়ের অনুধ্যান চির নবীন, অশেষ, অনন্ত।

কখনো পুরানো হবার নয়। এর যে কী অতলস্পর্শী গভীরতা, কী সুমধুর স্বাদ, যাঁরা তা ঠিকমতো পরিবেশন করতে সুকুশল, তাঁরা নানা-ভাবে তা বিভিন্ন গ্রন্থে পরিবেশন করেছেন। আমার ভরসা এই ডায়েরী।

লিখতে বসলেই দেখতাম, মায়ের লীলা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়, তবুও যা হয় লিখতাম। আজ মনে হয় তাঁর লীলা স্মরণ করে আমরা তাঁর সঙ্গ করতে পারি। বিশেষ করে যাঁরা শ্রীশ্রীমাকে কখনো দর্শন করেন নি, তাঁরা হয়ত আমাদের লেখার মাধ্যমে মাতৃসঙ্গসুখের কিছুটা আস্বাদ পাবেন।

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী কন্যাপীঠের স্বর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিতব্য এই ক্ষুদ্র গ্রন্থটিকে ঠিক দিনলিপির আকারে প্রস্তুত করা সম্ভব হয়নি; কারণ আমার কর্মব্যস্ত জীবনে প্রতিদিন রোজনামচা লেখা হয়ে ওঠেনি; হয়ত দু'চারদিন পরে স্মৃতি থেকে উদ্ধার করে লিখেছি, তার ফলে অনেক ঘটনার হুবহু তারিখ উল্লেখ নেই। দ্বিতীয়তঃ পূর্বেই বলেছি, মা যখন কাশীতে থাকতেন অথবা আমি যখন মায়ের সঙ্গে থাকতাম তখনকারই কিছু কিছু কথা লেখা হয়েছে। অসুস্থতা নিবন্ধন বা নানা পরিস্থিতিবশতঃ অনেকদিনই লেখা বাদ পড়েছে। উপরন্তু কোনো কোনো পাঠক-পাঠিকা ও উপদেষ্টার বিচারে শুধুমাত্র ডায়েরীর পাতা একত্র করে পুস্তকাকারে প্রকাশিত করলে তা তেমন হৃদয়গ্রাহী নাও হতে পারে—যদিও বিশেষ প্রতিভাসম্পন্ন লেখকের দিনলিপির কথা আলাদা। তাঁদের পরামর্শ মেনে দিনলিপির নির্বাচিত ঘটনাবলীকে বিভিন্ন শীর্ষক দিয়ে সাজানো হ'য়েছে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ঘটনা প্রবাহে মায়ের অপার্থিব মহিমা কী ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে তা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। তবু আমরা যে আনন্দ পেয়েছি, মুগ্ধ হয়েছি, চমৎকৃত হয়েছি, তা মনে রাখার জন্য এবং মায়ের মহিমা অনুধ্যান

করবার জন্য এ ক্ষুদ্র প্রয়াস। শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীচরণে অর্পিত এই বাক্ পুষ্পাঞ্জলি যদি মা দয়া করে গ্রহণ করেন, তবেই এই গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা সার্থক হবে।

—জয়া

"শুদ্ধ পবিত্র ফুলটি ভগবানের চরণেই তো পড়ে। নিজেকে ভগবানের চরণে অঞ্জলি দেবার জন্য সর্ব্বদা শুদ্ধ পবিত্র ভাবটি বজায় রাখার চেষ্টা।"

—শ্রীশ্রীমা

এক

মায়ের শিক্ষা

এক

মায়ের শিক্ষা

শ্রীশ্রীমায়ের জগৎজোড়া একটিই আশ্রম। মা বলেছেন, "এ শরীর আশ্রম বানায় না।" মা সমস্ত আসক্তি, মমত্ব, রাগ দ্বেষের ঊর্ধে। তবু মায়েরই মহাকরুণা-প্রসূত একটি সদিচ্ছা যখন দাদাভাই-এর মনে জেগেছিল, যে যে-সকল মেয়েরা, বিশেষতঃ কুমারীরা, ব্রহ্মচর্য আশ্রমে থেকে সাধন ভজন করতে চায়, তাদের উপযুক্ত একটা আশ্রম হোক্, মায়ের পূর্ণ সমর্থনে সে ইচ্ছা রূপায়িত হল কন্যাপীঠের আকারে। জগতে বিশেষতঃ অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের মধ্যে ব্রহ্মচর্যভাব জাগানোর দিকে মায়ের বিশেষ খেয়াল ছিল। সেই স্বতঃস্ফূর্ত খেয়ালের ফলেই ভাইজীর মনে যেমন জেগেছিল বিদ্যাপীঠ স্থাপনার প্রেরণা, তেমনি দাদাভাই-এর আগ্রহে ও অদম্য প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে কন্যাপীঠ। মায়ের স্নেহধারায় সিঞ্চিত হয়ে এই কন্যাপীঠ পুষ্পিত, পল্লবিত। মা বলেছিলেন, "দেখ, তোদের যদি কেউ কিছু বলে, এ শরীরে সূঁচের মত ব্যথা লাগে। তোরা সেইভাবে চলবি, যাতে কেউ কিছু বলতে না পারে।"

মা আমাদের চলা, বলা, কাজকর্ম,—সবই হাতে ধরে শিখিয়েছেন। ছোটবেলায় দেখেছি, মা আমাদের হলঘরে এসে দাঁড়িয়ে থেকে কে কোথায় শোবে, কোন্ দিকে মাথা দিয়ে শোবে, নিজে ঠিক করে দিতেন। সকাল, দুপুর, বিকেল, রাত্রে কখন খেতে হবে, সে নিয়ম করে দিয়েছেন। কাপড় জামা পরার বিষয়ে—যেমন শীতকালে কে কতগুলি শীতবস্ত্র গায়ে দেবে—তাও বলে দিতেন। মায়ের দেওয়া দণ্ড-পুরস্কারের বিধানগুলিও বড় সুন্দর। মায়েরই শুভ প্রেরাণায় কন্যাপীঠের বার্ষিক উৎসবের দিন মেয়েদের পুরস্কার বিতরণ করা হয়, এবং শুধু পরীক্ষায়

এবং সেলাই, গৃহ কলা, যোগব্যায়াম ইত্যাদিতে কৃতিত্বের জন্যই নয়, সত্য কথা, সদাচার, শীল, বিনয় ব্যবহারের জন্য এবং সেবাপরায়ণতার জন্যও মেয়েদের পুরস্কৃত করা হয়ে থাকে। এ ছাড়াও সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার মেয়েরা পেত মায়ের কাছ থেকে, যখনই মা স্বয়ং তাদের প্রশংসা করতেন, এবং অন্যদের কাছে প্রশংসা করে তাদের গৌরবান্বিত করতেন।

অনুশাসন রক্ষা ও চরিত্র শোধনের জন্য মা আমাদের নিম্নলিখিত নিয়মগুলি পালন করতে বলেছেন—

১—সদা সত্য কথা বলতে চেষ্টা করা।

২—কাহাকেও অপমানসূচক ভাষা না বলা।

৩—গুরুজনদের সঙ্গে সম্মান রেখে নম্র ও ভদ্র ভাষায় কথা বল। গুরুজনদের সামনে শান্ত ও হাসি মুখে থাকবে। মুখে-মুখে জবাব দিবে না। যদি সত্য মিথ্যা বোঝা যায়, তবে শান্ত ভাবে একলা গিয়ে বড়দের সত্যকথা জানানো।

৪—অনিন্দিত কথা বলা, অর্থাৎ অপ্রিয়, অশ্লীল ভাষা ব্যবহার না করা।

৫—গুরুজনদের সমালোচনা কখনই না করা।

৬—কাহারও সম্বন্ধে হাসি ঠাট্টা হলে বা নিন্দাসূচক চর্চা হলে সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য না রাখা, ও চেষ্টা রাখা যাতে এরূপ ব্যবহার না হয়।

৭—চোখ ঠারিয়া, চোখ টিপিয়া হাত নাড়িয়া, ইশারা-ইঙ্গিতে কাহারও প্রতি অসম্মানসূচক ব্যবহার না করা।

৮—ছোটদের প্রতি স্নেহের ভাব রাখিয়া, শান্ত গম্ভীর ভাবে শাসন করা, তাহাদের কল্যাণের জন্যই। বয়সে ছোট হোক্ বা বড় হোক্, কেহ মনে প্রাণে ব্যথা পায়, এরূপ কথা না বলা। কাহারও ব্যবহারে মনে দ্বন্দ্ব উৎপন্ন হলে জিজ্ঞাসার দ্বারা সমাধান করে নেওয়া।

৯—দল বাঁধা যেন হয়ই না। সত্য, সরলতা ও সততায় চরিত্র সুন্দর করা।

১০—শরীর রক্ষা, অসুস্থতা, ইত্যাদি বিশেষ প্রয়োজন ভিন্ন যেন কেহ কাহাকেও না ছোঁয়, এবং কেহ কাহারও শয্যা স্পর্শ না করে।

১১ – সমস্ত ব্যক্তিগত বা সংস্থাগত সমস্যার কথা দাদাভাইকে জানানো।

মায়ের খেয়াল অনুসারে দাদাভাই কন্যাপীঠের সঞ্চালন, ব্যবস্থাপনের গুরুত্বপূর্ণ ভার স্বয়ং গ্রহণ করতেন। এ ছাড়া পরমানন্দ স্বামীজী, ডঃ পদ্মা মিশ্র ও ডঃ বীথিকা মুখোপাধ্যায়ের ওপরেও কন্যাপীঠ সম্বন্ধীয় নির্ণয় গ্রহণের দায়িত্ব মা দিয়েছিলেন।

১৯৮০ সনের ২১শে ডিসেম্বর

মা আমাদের বললেন নিম্নলিখিত চারটি কথা খাতায় লিখে রাখতে, এবং কেউ এই চারটি আদেশ পালন না করলে দিন, তারিখ, নাম টুকে রাখতে, যথা —

১—মেয়েরা ঠিকমত পড়াশুনা করছে কি না।

২—ঠাকুরঘরে ঠিকমত বসে কি না।

৩ – সময় মত খেতে যায় কি না।

৪—বড়দের কথা শোনে কি না।

এই চারটি কথা চারটি ভিন্ন-ভিন্ন মেয়েদের বললেন লক্ষ্য করতে ও লিখে রাখতে।

মা আমাদের সবাইকে বলেছেন, "আলস্য ত্যাগ করবে। ভগবান যখন তোমাদের শরীর ও মন দিয়েছেন, তখন আলস্য একদম করবে না। আলস্য করা পাপ। আলস্যকে আলস্য করতে হয়।" মা আরও বলেছেন, "সত্য কথা, সৎ ব্যবহার, সৎ চরিত্র, শুদ্ধ পবিত্র জীবন গড়ার গতিতে সর্বক্ষণ চলা। বড়দের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করা। ভগবানের কাছে প্রার্থনা, 'আমি সৎ শুদ্ধসত্তায় নিত্যব্রতী যেন থাকি। তোমাতে যেন আত্মসমর্পণ করতে পারি।' সেই শক্তি জাগরণ, যাতে জগতে আদর্শ কুমারী হওয়া—এটি মনে রেখে চলার গতি-

ধারায় ব্রতী থাকা। মনে রাখা জন্ম সফল হওয়াই মানুষের মনুষ্যত্ব। নিজ আত্মতত্ত্ব প্রকাশ হওয়া। সেই লক্ষ্যেই তো থাকা। যারা শিশু-কাল হতে এই ধারায় চলেছে, তাদের শিরায় শিরায় যে শুদ্ধ শক্তি রয়েছে, তাদের তো আপনা আপনি শক্তিবৃত্তি জাগ্রত হতে বাধ্য। মধ্যে মধ্যে বিঘ্ন আসলেও পরে আবার সেই ধারাযুক্ত হয়ে চলার চেষ্টা। অনড় ভাবে যত দীর্ঘ সময় হয় সেই ইষ্ট চিন্তায় ধ্যানে মগ্ন থাকা। সকলের সঙ্গে একতা, মিত্রভাব রাখা।" কারোর মধ্যে ক্রোধ প্রকাশ হলে মা বলতেন, "তোমরা রাগ করবে কেন? ক্রোধ তো কাম থেকে হয়। তোমরা বিশ্বনাথের কাছে, গঙ্গার পারে থাক, তোমাদের এরকম কেন হবে?" রাগ হলে, খারাপ কথা বলে ফেললে, ১০ হাজার জপ করতে বলতেন।

আমরা যাতে ছুটির দিনেও বৃথা গাল্পগল্প করে, আলস্যে, সময়ের অপচয় না করি তার জন্য মা আমাদের দিয়ে নিম্নলিখিত কথাগুলি লিখিয়েছেন—

"অমূল্য সময় বৃথা নষ্ট না করা, কারণ—এই সময়টা (ছুটির সময়) বৃথা নষ্ট করিলে আলস্য ও রোগীদের দিক্ বৃদ্ধি হইবে, সেইজন্য উৎসাহের সহিত সময় বাঁধিয়া নিম্নলিখিত কাজ দেওয়া—

মেয়েদের পরীক্ষা হইয়া গেলেই সকলকে সেলাই এর ভার দিতে হইবে। ছোট-ছোট যাহারা নিজেদের জামা সেলাই করিতে পারে না, তাহাদের এবং নিজেদের বৎসরের সব জামা ইত্যাদি এই ছুটির সময়ের মধ্যে করিয়া ফেলিতে হইবে। এই কাজ হইয়া গেলে অন্যান্য নানা রকম সেলাই শিখিবে। ছোট ছোট মেয়ে যাহারা জামা সেলাই করিতে পাবে না, তাহাদের উলের কাজ, ক্রুশিয়ার কাজ শেখাইতে আরম্ভ করা। এক এক জনকে ভার দেওয়া। এক এক দিনে কতটা কাজ হইল তাহা দেখিবার জন্য দুই-এক জন মেয়েকে থাকিতে হইবে। নিজেদের জামা, সেমিজ ইত্যাদি নিজে করিয়া নেওয়া।

ইহার ভিতর যদি সময় হয়, তিন চার মাসের রান্নার মশলা ধোয়া, বাছা, পরিষ্কার করিয়া রাখা। বৎসরের সব বিছানা-বালিশের ওয়াড় ইত্যাদি সেলাই করিয়া রাখা। অবসর মত যে যতটা জানে ও পারে কাঁটার ও ক্রুশিয়ার কাজ করিবে এবং শিখিবে। ভাণ্ডারের সব গুছান—দরকার হইলে রং করা—এইসব কাজগুলি ছুটির মধ্যে করিয়া ফেলা।

এইভাবে সুশৃঙ্খলা মত নিজেদের কাজ নিজেরাই ভালভাবে করিয়া ফেলা। ইহাতে শরীরের মাথার জড়তা নষ্ট হয়। বুদ্ধিও খুলিবার দিক্। পড়া ইত্যাদি সব কাজেরই অনুকূল হয়।"

সর্বদা পালনীয় শিক্ষারূপে এই কথা মা লিখিয়েছেন—

"সত্য কথা বলা। শান্ত পরিবেশে, ধীর, গম্ভীর ভাবধারায়—শাস্ত্র নীতি, বিধি অনুসারে নিজের জীবন গড়িয়া তোলা।

সমস্ত ব্যবহার্য জিনিস সাজাইয়া, গুছাইয়া রাখা। যে ভিক্ষার জিনিস নষ্ট করিবে, তাকে বিশেষ শাস্তি দেওয়া।

বড়রা যখন যাহা সুবিধা মত করিতে বলে, আনন্দে ও নির্বিচারে করা। কেহ কাহারও উপর দোষ দেওয়া তো নাই—দোষ জনক আলোচনাও না হওয়া। প্রয়োজনীয় কথা বলা।"

মায়ের এই উপদেশগুলি যে সদ্যফলপ্রসূ, মান্য করলে কল্যাণের পথে অগ্রগতি হয় ও অমান্য করলে শান্তি ও আনন্দ বিঘ্নিত হয়, তা' অহরহঃ অনুভব করা যায়।

মা আমাদের বলতেন নিন্দাস্তুতিতে সমভাব রাখতে। ১৯৭৬ সালের মে মাসের কথা। আমার সম্বন্ধে কোন সমালোচনা কানে আসায় মন খারাপ করে মাকে গিয়ে বললাম। মা বললেন, "ঐ সব কথা মনে নিতে নাই। আমাকেও তো অনেকে অনেক কথা বলে।"

কন্যাপীঠের মেয়েদের কাশীযাত্রার প্রাক্কালে মা বলেছিলেন, "বেশী কথা বলবি না। বাজে কথায় ভুলিয়ে রাখে। কেউ কিছু

বাজে কথা বলবি না। সব সময় মনে মনে জপ করবি। কেউ কিছু বললে রাগ করে 'আমাকে কেন বলল? আমিও চার কথা শুনিয়ে দেব', এরূপ জব্দ করার ভাব যেন না আসে। আবার কেউ কিছু বলছে, সেদিকে লক্ষ্যই করলাম না, এরূপ উপেক্ষার ভাবও না আসে। দেখবি, কেন আমাকে বলে? আমার মঙ্গলের জন্যই বলে তো',— এরূপ বিচার করে মন্দটা ত্যাগ করে ভালটা গ্রহণ করার চেষ্টা করবি। ···আরও তোদের বিশেষভাবে বলি, তোরা সকলে হিংসা, পরনিন্দা ও পরচর্চা ত্যাগ করবি ও সত্য কথা বলবি। সকলের সঙ্গে মিত্রভাব রাখবি। পবিত্র, শুদ্ধ নিজেকে রাখা। কাশীতে তো মিথ্যা কথা বলা আরও মহাপাপ। কাশীতে জপ করলে যেমন দশগুণ বেশী ফল হয়, পাপ করলেও তেমনি দশ গুণ বেশি পাপ হয়—একথা মনে রাখা। আর কেউ কাউকে হিংসা করবি না, আলস্য একদম ত্যাগ করতে হবে। জপের সময় ঘুমোলে চলবে না, চোখে জল দিয়ে হেঁটে হেঁটে ঘুম ভাঙ্গাতে হবে। যখন জপে বসবি, বেশ সরল সোজা হয়ে চোখ বুজে বসবি। বাইরে থেকে যেন ঘুমিয়ে আছিস্ এরূপ দেখা যায়, কিন্তু ভিতরে জাগ্রত থাকবি। যখনি খেতে, ঘুমাতে, যে কোনো বিষয়ে রস-বোধ হবে, তখনি ভাবব্দি, 'আরে, আমি যদি এই রসে ডুবে থাকি, তাহলে তো ঠাকুরের এই আনন্দ মহারস বোধে আসবে না।' একটু ভাল কিছু খাবার সময় যখনই আস্বাদ মনে করবি, তখনিই মনে করবি, 'আমি তো এই আস্বাদেই রইলাম, ঠাকুরের আস্বাদ তো পেলাম না।' তখনি বলবি, 'না, আমি এই আস্বাদ ভোগ করব না, আমি ঠাকুরের আনন্দরস বোধ করব।' তোদের আরও বলি যে অসুখ করলেই তার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে এলিয়ে না দিয়ে একটু মনের জোর রাখবি। মনের জোরে অনেক সময় অনেক রোগ ভাল হয়ে যায়। অসুখ হবে কেন? ভাববি, যে 'আমি বেশ আছি, আমার কোন অসুখ নাই। আমার আবার অসুখ কি?' সব সময় খুব আনন্দে ও শান্তিতে সরল উদার

থাকতে চেষ্টা করবি। এখন তো কাশী যাচ্ছিস্। কাশী সাধন ভজনের খুব ভাল স্থান। কাশীতে সর্বত্রই শিবময়। এবার শিবরাণী হয়ে যাবি। আমি কিন্তু জগতের রাণী বলছি না। দেখিস্ না, মহাত্মাদের বলে স্বামীজী। 'স্বামী' মানে—তুমি মাতা, তুমি পিতা, তুমি সখা। স্বামী—অর্থাৎ আমার সেই মহা 'স্ব'—আমিই।··· ঐ যে শিবরাণী—শিব না থাকলে শিবরাণী কোথায়? আবার শিবরাণী, মহাশক্তি, সত্ত্বা-স্বরূপিণী। মহাশক্তি স্বরূপ না থাকলে শিব মঙ্গলময় কোথায়? পরব্রহ্ম পরমাত্মা স্বরূপ। যা নিত্য আছে, প্রকাশ হওয়া তো! সেই লক্ষ্য ধারায় চলা। মনুষ্যত্বেরই দিক্ হওয়া। মনে ও বাইরে মানুষ হওয়া। হুঁসের ধারা ধরে এই দিক্ও হওয়া প্রয়োজন। যে মহাশক্তি প্রকাশে কুমারী শক্তি, তোমাদেরই সেই জাগরণ প্রয়োজন। ঐ শিবরাণী।···'স্ব'—আমিই সেই স্বামীজী মহারাজ। ·· যিনি শিব, তিনিই শিবরাণী, যিনি শিবরাণী, তিনিই শিব।"

অনেক সময় স্বপ্নে, ধ্যানকালে বা তন্দ্রাবস্থায় কিছু অলৌকিক বা অদ্ভুত দর্শন হলে আমরা মাকে জানাতাম এবং ঐ দর্শনের তাৎপর্য জানতে চাইতাম। একবার কোন এক দিদি তাঁর অলৌকিক দর্শনের কথা মাকে জানাতে, মা বলেছিলেন, "এই যে দর্শন-টর্শন হয়, এর সঙ্গে চরিত্রের পরিবর্তন হওয়া চাই, তা না হ'লে দেখার বিশেষ মূল্য নাই। একের পর এক ছবি দেখে যাওয়া মাত্র! লোকেও বিশ্বাস করে না। স্থিতি অনুসারে দেখবি, আরও কত রূপে, কত ভাবে দেখতে পাবি। একটু দেখিস্ বলেই কিছু হ'য়ে গেল মনে করিস্ না। দেখতে হবে—দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে আমার কোন পরিবর্তন হচ্ছে কি না। কী দেখছি? এ কী? এরূপ বিচার করবি। 'আরও কী কী আছে, সব দেখব'—এরূপ আকাঙ্ক্ষা রাখবি।"

১৯৭৫ সালের ২১শে অক্টোবরের কথা। রাত দশটার সময় হলঘরে এসে মা আমাদের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বললেন। মেয়েরা

সকলেই উপস্থিত ছিল। মায়ের কাছে তাদের জন্য উপদেশ প্রার্থনা করায় মা বললেন, "সত্য কথা বলবে, মিথ্যা কথা বলবে না। সত্য কথা বললে দেখবে যে যা বলবে, সেই কথাই ফলে যাবে, আর সবাই দেবী ভাবে পূজা করবে। কার পূজা করবে? সেই সত্যের পূজা, ভগবানের পূজা করবে।"

চরিত্র গঠন সম্বন্ধে মা বললেন, "বড়দের কথা শুনবে। ঘণ্টার সাথে সাথে চলবে। কেউ কাউকে মারবে না। সকালবেলা আর রাত্রিবেলা ভগবানকে হাতজোড় করে প্রণাম করবে, আর বলবে, 'আমি যেন সারাদিন ভাল হ'য়ে চলি।' রাগ করবে না। সবাই হাসিমুখে থাকবে। প্রীতিভাবে চলবে। সকলেই ত ভগবানের সন্তান।"

১লা আগষ্ট, ১৯৭৪

আজ মা বললেন, "প্রত্যেকের চুল যদি সমান না থাকে তাহলে প্রশ্ন উঠবে, আমরা কেন রাখব না? চুল কেটে, পরিষ্কার কাপড় পরে, ভস্ম লাগিয়ে টিপ পরে ঝুলনে যাবে। যদি সৌন্দর্য বাড়াতে চাও, তাহলে গৃহস্থ আশ্রমে যাও। যখন বাড়ী যাবে, তখন চুল রাখবে।"

আবার বললেন, "মেয়েদের কীর্তনের, স্তবের, পাঠের আওয়াজ শোনা যাবে। রেষারেষির আওয়াজ যেন শোনা না যায়। নোটিস করে রাখবে। অল্পবয়স্ক পুরুষদের সাথে কথা বলবে না। যা বলার মাষ্টারদের বলবে, পরমানন্দকে বলবে।"

একদিন মা আমাদের বললেন—"কেবল সত্যানুসন্ধানই মানুষের হওয়া। দেহ-মন শোধন করিতে হইলে সেবা, তৎক্রিয়াজনিত শূন্যাবস্থায় সেই দেহ-মনখানি ২৪ ঘণ্টা নিজ প্রাপ্তির জন্য সেই দিকেরই কর্মাদিতে লগ্ন মগ্ন রাখিতে হয়। মনের গতির ফাঁক দিতে নাই, নিজেকে তৎলক্ষ্যের গতিতে গড়িতে হইবে ত', নিজেকে পাওয়ার জন্যই। স্থানে

স্থানে এই বিগ্রহ পূজাদি ও যাহার যেখানে যে যে অনুষ্ঠান জপ তাহাতে মনকে ডুবাইয়া না রাখিলে বিশ্বজগতের প্রাকৃতিক গতির মধ্যে দেহ মন টানিয়া বিক্ষেপের দিকে লইয়া যায়। সেই স্রোত বন্ধ করিতে হইলে নিজেকে পাওয়ার যাত্রীগণের আলস্যশূন্য তীব্রতার সহিত মনপ্রাণ লাগাইয়া এ সমগ্র কর্মে নিজেকে বাঁধিয়া রাখা, তৎশক্তি জাগ্রতের দিক্ যাহা।

মহাধৈর্যের আশ্রয়ে ধীর, স্থির, গম্ভীর, শান্ত হওয়ার জন্য এক লক্ষ্য হওয়ার দিক্ নেওয়া। কর্ম সংস্কার সৎকর্মে যাহার যে যে কর্ম নিলে মুক্ত হওয়া যায়, ইহা যাত্রীর গ্রহণীয়। নিরন্তর জপে লগ্ন, ধ্যানে মগ্ন হওয়ার চেষ্টা। যাহার যে লক্ষ্য সেই লক্ষ্যের দিক্ পূরণ হওয়া। যাহাকে যে অনুষ্ঠান দেওয়া হয় হৃদ্যতার সহিত করা। যাহার যাহার গুরুর আদর্শ সর্ব্বক্ষণ পালনীয়, গুরুসেবায় ত্রুটি না হয়।

গরমের সময় ৪টায় শয্যাত্যাগ, শীতের সময় ৫টায় শয্যাত্যাগ করা, ঊষায় মঙ্গল আরতি ঠিক ঠিক সময় মত হওয়া, স্নান করিয়া শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিয়া গঙ্গা বা যমুনার জলের ছিটা লইয়া মন্দির খোলা। ঠাকুরের নাম অন্ততঃ তিনবার ত করিবেই বেশী হইলে ভাল, তাহার পর শঙ্খধ্বনি করিয়া শয়ন মন্দিরের দরজা খুলিয়া ঘরে যাইয়া ঘণ্টা বাজাইয়া পরে ১০৮ বার জপ যাহার যাহার মন্ত্রে।

গঙ্গা বা যমুনার জলের ছিটা দিয়া, স্থান মুছিয়া ভোগ ও মঙ্গল আরতি। সময়মতো ফুল তোলা, পূজার যোগাড় করা, মন্দির পুঁছিয়া পূজার জায়গা করা, আয়োজন করিয়া পূজা করা, পূজার স্থান পরিষ্কার করিয়া ভোগ দেওয়া, ভোগান্তে সমস্ত মন্দির মুছিয়া ফেলা। মন্দিরে কোন সময়ই কথা না বলা। মন্দির পরিষ্কার করিয়া বেলা ১২টায় দরজা বন্ধ করিয়া শয়ন দেওয়া, শয়ন দিয়া দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া একটু জপ করিয়া প্রণাম করা।

বৈকাল ৪টার সময় স্নান করিয়া বা কাপড় ছাড়িয়া যমুনা বা গঙ্গা জলের ছিটা লইয়া ভগবানের নাম করিতে করিতে প্রণাম করিয়া দরজা

খোলা, ঘণ্টা ধ্বনি করা। তারপর বৈকালী দেওয়া। সমস্ত কার্য সম্পন্ন করিয়া। লোহার গেট বন্ধ করিয়া দেওয়া।

সন্ধ্যায় নিজ বস্ত্রাদি পরিবর্তন করিয়া পারিলে স্নান করিয়া যমুনা বা গঙ্গার জলের ছিটা লইয়া মন্দিরে প্রবেশ করা। মন্দিরে প্রবেশ করিবার সময় সব সময়েই গঙ্গা বা যমুনার জলের ছিটা লওয়া। যথা-সময়ে স্নান ও বস্ত্রাদি পরিবর্তন করা। ঠিক ঠিক সন্ধ্যাবেলায় সন্ধ্যারতি হওয়াই চাই। সন্ধ্যায় আরতি ভোগাদি দিয়া সময় মত ঠাকুরের শয়নের উপযোগী স্থান মুছিয়া ব্যবস্থা করা। বেদী ও সমস্ত মন্দির ভাল করিয়া মুছিয়া ফেলা, তাহার পর যাঁহার যাঁহার স্থানে যথানিয়মে শয়ন দেওয়া এবং একটু জপ করা, পরে ভগবানের নাম করিতে করিতে মন্দির বন্ধ করিয়া শঙ্খধ্বনি করা ও প্রণাম করা। শীতের সময় ৮॥টা থেকে ৯টার মধ্যে মন্দির বন্ধ করা। গরমের সময় ৯॥টা থেকে ১০টার মধ্যে বন্ধ করা। মধ্যাহ্ন ভোগ ১১টা হইতে ১২টার মধ্যে হওয়া চাই। সপ্তাহে একদিন না পারিলে মাসে ২-৩ দিন বস্ত্র পরিবর্তন করা। সেলাই করা কাপড় ও জামা পরিয়া কেহ মন্দিরে প্রবেশ করিবে না।

মনে করা আমার মাথা ভগবানকে প্রণাম করার জন্য, আমার চক্ষু ভগবানকে দর্শন করার জন্য, ভগবানকে পাওয়ার দিক্ মানে নিজেকে পাওয়ার দিক্। আমার কর্ণ ভগবৎ কথা শুনিবার জন্য। যাহার আত্মস্থ হওয়ার দিক্, সৎসঙ্গ, সৎপ্রসঙ্গ ইত্যাদি শ্রবণীয়। নাসিকা 'তাঁহারই' অলৌকিক সুগন্ধাদি গ্রহণে মগ্ন। মন পাগলের মত -- ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য লালসা জাগ্রত হওয়া, মুখে তাঁহারই নাম। গানে, ভগবৎ কথায়, জপাদিতে নিজেকে তাঁহারই চরণে সমর্পিত করার দিক্। আত্মদর্শন হওয়ার যে বিচার গ্রন্থাদিতে, মনে প্রাণে লক্ষ্য গ্রহণের দিক্। মন প্রাণ দুই হাতও তাঁহারই সেবায় চিত্তশুদ্ধির দিক্। যাহা এই সমগ্রই সব কিছু হৃদয় দিয়া হওয়া। নিজ দুই পায়ের চলার গতি তাঁহারই সেবা ক্রিয়ার জন্য, যখন চলা তাঁহাকেই সব সময় পরিক্রমা, নিজেকে পাওয়ার জন্যই এই সব গতিবিধি সবকিছু।"

মা প্রত্যেকটি বস্তু বিশেষ যত্ন করে রাখতেন। একটা সুতলী পর্যন্ত ফেলতেন না। সামান্য কাগজও মাকে ফেলতে দেখি নাই। ভক্তদের দেওয়া বস্ত্রাদি সযত্নে রাখতেন।

একদিন কান্তিজীকে সুতলীর ঠোঙ্গা দেখিয়ে মা বললেন, "এই শরীর তো কোন জিনিষ ফেলে না, তোমরা তো ফেলে দাও", এই বলে গুছিয়ে রাখতে বল্লেন।

তখন কান্তিজী বল্লেন, "আমরা রেখে দেই।"

মা তখন খুব মজা করে ঘাড় নেড়ে বল্লেন, "য়হ শরীর তো দেখা নহী।"

মা আমাকে ১৯টা ডালা দিয়ে বল্লেন, "নিমপাতা দিয়ে বেঁধে রেখো। গালিচাটা পেতে রেখো। নষ্ট যেন না হয়!" প্রত্যেকটি জিনিষের প্রতি মার দৃষ্টি ছিল।

জনৈক ভক্ত মাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কিভাবে সৎভাবে থাকা যায়?"

মা বল্লেন, "সৎসঙ্গে, সৎপরিবেশে মন রাখবে আর মনে মনে জপ করবে, ধ্যান করবে, আর নমস্কার করবে। কোন ঠাকুরকে ভালবাস?"

তিনি বল্লেন, "কালী ঠাকুরকে।"

মা বল্লেন, "জপ করো।"

মা কিছুদিনের জন্য সাধু কুটিয়াতে গেলেন, সেখানে মেয়েদের যাওয়া নিষেধ। আমি মাকে বল্লাম, "মা কথা আছে।" মা দাদাভাইকে দিয়ে খবর পাঠালেন, "ওকে বড় বড় করে লিখে দিতে বল, আমি পড়ব আর কাউকে দেব না।"

তবুও আমি লিখি নাই, সন্ধ্যাবেলা মা আমাকে আবার লিখে উদাসজীর হাতে দিতে বল্লেন।

আমার প্রশ্ন ছিল, এখানে কি করে থাকব? কেউ আমার নামে মাকে নালিশ করেছিল তাতে মা আমাকে কিছু বলেছিলেন। মা উত্তর

হিন্দীতে দিয়েছেন, "মা জো কহা উস তরহসে চলনে কী কোশিশ করনা, পরমানন্দ জ্যায়সা কহা উস ঢং সে চলনা। পদ্মাজী তো হ্যায় হী, উনসে সলাহ লেকর চলনা, উসসে সব তরহ সে আচ্ছা হোগা, শান্তি রহেগা, সব সময় মন প্রসন্ন রখনা। কায়দা করকে, বুদ্ধি করকে চলনা, জিসসে কোই কুছ কহ নহী সকে। তুম্হারা প্রশংসা তো হ্যায় হী, মনমে শান্তি রখনা, জপ-ধ্যানমে মন রখনা।"

চিঠি পাওয়ার পর মার সঙ্গে দেখা করতে সাধু কুটিয়াতে গেলাম। মা বল্লেন, "অন্ধকার রাস্তা, সাবধানে যেও।"

মা আমাদের জন্য অনেক ফল পাঠিয়েছিলেন। ফল নিয়ে কাশী রওনা হলাম।

মা সকলের কাছে ১৫ মিনিট মৌনের ভিক্ষা চেয়েছিলেন। মা বলতেন, "যারা এ শরীরটাকে তাদের ছোট্ট মেয়ে মনে করে, আপন ভাবে, তাদের কাছে এই ছোট্ট মেয়েটা আবদার করে এই সময়টুকু চাচ্ছে। আর যারা এই শরীরটাকে পর মনে করে তাদের কাছে এ শরীরটা এই সময়টুকু ভিক্ষা চাচ্ছে। এ শরীরটা চাচ্ছে প্রত্যেকে যেন ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যে কোনও সময়ে ১৫ মিনিট কাল তাঁকে দেয় এবং সেই সময়টা শুধু ভগবানকে স্মরণ অথবা কাজ কর্মের মধ্যে থাকলেও ঐ সময় যেন মৌন থাকে।"

কন্যাপীঠের মেয়েদের মা ৭টা থেকে সওয়া ৭টা পর্যন্ত মৌন থাকতে বলেছেন। পৌনে ৯টা থেকে ৯টা পর্যন্ত মা সব আশ্রমে মৌনের ব্যবস্থা করেছেন।

অন্য সময় মা মেয়েদের উপদেশ দিয়েছেন, "ভাইজীর সৎসঙ্কল্পের ফলস্বরূপ দিদি ভিক্ষা করে কন্যাপীঠ তৈরী করেছিলেন। মেয়েদের মানুষ করেছেন। দিদির নিজের জীবনের আদর্শ হচ্ছে—আমি আশ্রমবাসী, আশ্রমের আমি, আশ্রমই আমাকে দেখবে। তাই দিদি নিজস্ব নামে

তাঁর বাবা মার দেওয়া কোনও টাকাই রাখেন নি, আশ্রমের সেবায়ই সব কিছু দিয়ে দিয়েছেন। •

চন্দন, বিশুদ্ধা, নীলিমা দিদির আদর্শ নিয়েছে। এখন আর সকলকে যেমন জয়া, গীতা, মালা প্রভৃতিকে জিজ্ঞাসা করা, যেমন সত্য সরল ভাবে চন্দন বিশুদ্ধা নীলিমা একটা দিক্ নিয়েছে সেই রকম ওরাও নিতে পারে।

যদি কারো মনে হয়, দিদি কন্যাপীঠে যে ভাবে আমাদের সেবা করেছেন—আজ আমরাও সে ভাবে কন্যাপীঠের সেবাই করব, সে দিদির আদর্শ নিতে হলে নেবে। আর যদি নিজেদের একটু সঞ্চয় রাখবার ইচ্ছা মনে আসে তবে আশ্রম থেকে যতটুকু মাহিনা দেওয়া হয়, তার থেকে কন্যাপীঠে সেবার জন্য দান করতে পারা যায় আর মাহিনার বাকী টাকা থেকে নিজের খাওয়া খরচ ও চিকিৎসার খরচ পূর্ণ করে বাকী টাকাটা থেকে কখনও তীর্থযাত্রা, কখনও কোনও সৎকাজে ইচ্ছামত ব্যয়, অথবা সংসারত্যাগী পিতামাতার অভাবজনিত যদি কোনও প্রয়োজন থাকে, তবে যতটুকু হয় পিতামাতা ও পরিজনদের জন্য সৎসঙ্গে সদ্‌গ্রন্থ ও পূজাবস্ত্রাদিতে ব্যয় করতে পারে। আশ্রমবাসী যেহেতু নিজ জীবনের নিশ্চিন্ততা আর আশ্রমবাসিগণের নিজ বয়স অনুযায়ী রক্ষিত, বাকী যাহা, ভবিষ্যতে কন্যাসেবায় দান—ইচ্ছা হলে লিখে রাখতে পারে। বস্ত্রাদি সম্বন্ধে যতদিন আশ্রমের বস্ত্রাদি দানের প্রাপ্তি থেকে পাওয়া যায় তারাও পাবে।

আশ্রমে প্রতিপালিত মেয়েদের ২৫ বৎসর শিক্ষাদান করা, ইচ্ছা হলে বেশী। পরমার্থ যাত্রার অনুকূল ক্রিয়ায় নিত্যব্রতী হওয়া।"

১৯৭৫ সনের ঘটনা! কন্যাপীঠের মেয়েরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেই মায়ের সঙ্গে দেখা করে। মায়ের বাণী শুনে আমাদের মনে খুব আনন্দ হয়। গুণীতা আচার্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী আনতে যাবে। ডিগ্রীর পোষাক এসে গেছে। গুণীতা পোষাক পরে

মাকে দেখাল। টুপিটা বড় অপরিষ্কার ছিল। গুণীতা মার সামনেই বলে উঠল, "এত বিশ্রী, আমি পরব না।" মা বল্লেন, "কোন জিনিষকে বিশ্রী বলবে না।" অতি তুচ্ছ কথাও মা সংশোধন করে দিতেন, যাতে ভবিষ্যতে আমাদের ক্রটি না হয়।

১৯৭৭ সনের ৬ই জানুয়ারী

মা কাশী থেকে এলাহাবাদ যাচ্ছেন। যাওয়ার আগে মা গোপাল মন্দির, অন্নপূর্ণা মন্দির দর্শন করে যজ্ঞ-মন্দিরে এলেন। যজ্ঞ-মন্দির প্রদক্ষিণ করে মা সকলের দিকে তাকিয়ে হাতজোড় করে বল্লেন, "তোমরা ভাল থেকো, ক্ষমা করে নিও একে অন্যকে।"

ব্রহ্মচর্য

আমরা কন্যাপীঠের মেয়েরা যাতে ব্রহ্মচর্য নিখুঁতভাবে পালন করি, সেদিকে স্বাভাবিক ভাবেই মায়ের বিশেষ খেয়াল ছিল কারণ কন্যাপীঠ ব্রহ্মচর্য আশ্রমের একটি পীঠস্থান। বালিকা এবং বয়স্করা ব্রহ্মচারিণী-গণের শিক্ষা, দীক্ষা ও সাধনার স্থল। আমাদের ব্যবহার, হাবভাব, পোষাক পরিচ্ছদ ও সাজসজ্জার সামান্যতম ক্রটিও মায়ের চোখ এড়াত না।

আমরা চুল ছোট রাখি। একবার দু'একটি মেয়ের চুলের তারতম্য লক্ষ্য করে মা বললেন, "তোমরা এক রকম চুল কাটবে।" চুলের ছাঁটে যদি নানারকম হেরফের করার ছুট দেওয়া হয়, তা'হলে মেয়েদের মনে বিলাসিতার ভাব জাগতে পারে, তাই মনে হয় মায়ের এই আদেশ।

ক'একজন অবসর প্রাপ্ত প্রবীণ পণ্ডিত আমাদের পড়াতে আসেন। মা আমাদের বলেছিলেন, "তোমরা পণ্ডিতদের মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলবে না। মুখ নিচু করে কথা বলবে। তোমাদের মঙ্গলের জন্যই তো বলি।"

অপর দিকে বয়স্ক ও বিদগ্ধ পণ্ডিতগণ যাতে যথোচিত সম্মান লাভ করেন, তার জন্যও মা আমাদের সর্বদা তৎপর থাকতে বলতেন।

১৯৭৭ সালের ৬ই জানুয়ারী

মা কাশীতে রয়েছেন। দর্শনার্থীর ভিড় যেমন হত, সেদিনও হয়েছে। ভিড়ের মধ্যে আমাদের একজন পণ্ডিত শিক্ষকও ছিলেন। অসাবধানতা-বশতঃ আমরা লক্ষ্য করিনি। পণ্ডিতজী কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে মায়ের দর্শন না পেয়ে ক্ষুণ্ণ মনে ফিরে গেলেন। আমাদের ওপর কিছু অসন্তুষ্টও হলেন।

পণ্ডিতজী চলে যাওয়ার খবর পেয়ে মা কান্তিজীকে ডেকে পাঠালেন ও বললেন, "তোমরা ফল আর মিষ্টি নিয়ে পণ্ডিতজীর কাছে যাবে। তাঁকে বলবে, মা শুনলে আপনাকে ঠিক ডেকে নিতেন। মায়ের তরফ থেকে আমরা এসেছি। আমাদের দোষ হয়ে থাকলে আপনি ক্ষমা করে দেবেন।"

কুমারী ব্রহ্মচারিণীদের প্রতি মায়ের বিশেষ অনুগ্রহ সর্বদাই লক্ষ্য করেছি। টিহিরির মহারাজা একবার বদরীনারায়ণজীর প্রসাদ, কাপড়, চন্দন ইত্যাদি পাঠালেন। মা সর্বপ্রথমে কন্যাপীঠের মেয়েদের ডেকে প্রসাদ দিলেন। মা বললেন, "তোমরা এখানে বড় হয়েছ, পড়াশুনা করে প্রধান হয়েছ, তাই তোমাদের দেওয়া হল।" কান্তিজীকে দেখিয়ে বললেন, "ও সারা জীবন কুমারীজীবন কাটিয়ে এখন শিক্ষা দিচ্ছে, তাই ওকেও দিলাম।"

১৯৭৪ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারী

সেদিন আমাদের বার্ষিক উৎসব ছিল। মনে হয় শীত করছিল বলেই আমি কাপড় দিয়ে মাথা ঢেকেছিলাম। তখনও উৎসব আরম্ভ

হয়নি। মা আমায় দেখে বললেন, "মাথা খোলা রাখ। সেটাই ভাল। কুমারীরা মাথায় কাপড় দেয় না।"

যদিও আমাদের দেশের কোন কোন প্রদেশে কুমারী মেয়েরাও মাথায় কাপড় দেয়, কিন্তু আমাদের অর্থাৎ বাঙালী মেয়েদের সংস্কার আলাদা। বিশেষতঃ কন্যাপীঠের সাধারণ রীতি অনুসারে আমরা বিভিন্ন প্রদেশের মেয়েরা সবাই মস্তক অনাবৃত রাখি এবং ছোটবেলা থেকে সেটাই আমাদের সংস্কারে পরিণত হয়েছে। আমাদের সংস্কার অনুসারে কুমারীবেশ ধারণ করলে কৌমার্যের ভাব পুষ্টি লাভ করবে। অনেক ভাব, অনেক স্মৃতি, শৃঙ্খলিত অবস্থায় মনের মধ্যে থাকে, একের দ্বারা অন্য আর একটির উদ্দীপন হয়ে থাকে। তাই মা সর্বদা বিশুদ্ধ ভাব সেবন করতে বলতেন।

সেদিনকার উৎসবে সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় এবং কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের কুলপতিদ্বয় এবং বহু খ্যাতনামা পণ্ডিত এসেছিলেন। মেয়েদের প্রোগ্রাম দেখে মা খুশী হলেন। নানারকম কৃতিত্বের জন্য মেয়েদের পুরস্কার দেওয়া হল। অনুষ্ঠান শেষে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ক' একজন শিক্ষয়িত্রীকে নিয়ে আমি মায়ের কাছে গেলাম, তাঁরা মাকে প্রণাম করলেন। পদ্মাজী মাকে বললেন, "মা, এরা সব কুমারী। চন্দন, বিশুদ্ধা, জয়া এদের পড়িয়েছে।" মা বললেন, "কুমারীরা কুমারীদের সেবা করছে। তোমাদের কন্যাপীঠ, তোমরাই গড়ে তুলেছ।"

রাত্রে মা আমাদের বললেন, "মেয়েদের কথা বলার ঢং, ওঠা-বসা, চুল, পোশাক—সবই নিখুঁত। তোমরাই শিখিয়েছ।" কান্তিজী বললেন, "মেয়েরা নিজেরাই প্রোগ্রাম তৈরী করেছে।" মা বললেন, "তোমরা (মেয়েরা) তো সব দেখিয়ে দিলে। তারা সব (উৎসবের অভ্যাগতমণ্ডলী) তোমাদের বলে গেছে ঋষিকন্যা।" মা আমাকে বললেন, "মাথা খোলা, ভাল লাগছিল। বেশ পবিত্র, ত্যাগের ভাব।"

পরদিন পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের বিষয়ে মা পদ্মাজীকে বলেছিলেন,

"কাল মেয়েদের চুল, পোশাক, ওঠা-বসা, নিঃসঙ্কোচভাবে বলা, সরল দৃষ্টি, বাইরে-ভেতরে খোলা ভাব, পবিত্র ভাব—সব মিলিয়ে ঠিক ঠিক আশ্রম-উপযোগী যা হওয়া উচিত হয়েছিল। এই শরীরটাকে তোমরা এইরূপেই দর্শন দিয়েছ। যারা এসেছিল, অনেকে বলেছে, এরা সব ঋষিকন্যা। এই সময়ে এই শরীরের জন্যই তোমরা সব এসেছ।" পদ্মাজীর হাত ধরে মা বললেন, "পাঁচ বছর বিদেশে ছিলে, তোমার এই আদর্শ কুমারী জীবন এক বিন্দুও স্পর্শিত হয় নি। তুমি এখন এই মেয়েদের সেবার জন্য আছ।"

১৯৭৫ সালের ২৬শে জুন

আজ কন্যাপীঠের হু'টি মেয়ে বাড়ী ফিরে যাবে, তাই মাকে প্রণাম করে বিদায় নিতে এসেছে। অন্যান্য কথার পর বিদায়কালে মা মধুর ভাষায় তাদের বললেন, "ভাল হয়ে থাকবে। মা-বাবার কথা শুনবে। বড় হয়ে যোগ্য হয়ে, আবার এখানে আসবে। পরপুরুষের দিকে তাকাবে না। মাথা নিচু করে কথা বলবে। বলে দিও, আমাদের আশ্রমের এই নিয়ম। পবিত্র ভাবে থাকবে।"

দীক্ষা

কন্যাপীঠের যে সব মেয়েরা স্বেচ্ছায় দীক্ষা গ্রহণ করতে চাইত মা তাদের দীক্ষার ব্যবস্থা করতেন। সাধারণতঃ অন্যূন ১০-১২ বছরের মেয়েদেব দীক্ষা হত তাদের আপন আগ্রহে। দীক্ষার্থিণী কুমারীদের মা বলতেন অভিভাবকদের অনুমতি নিতে। দীক্ষাকালে মা প্রত্যেককে জিজ্ঞেস করতেন কার কোন্ ঠাকুরের নাম রূপ পছন্দ। মা তো সব সম্প্রদায়েরই মা, সর্ব দেবদেবীময়ী মায়ের কাছে শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব, নিরাকার, সাকার—সবকিছুরই স্বীকৃতি আছে। মা কাউকে বীজমন্ত্র দিতেন, কাউকে শুধু নাম দিতেন, আধার ভেদে। আবার ক্রমদীক্ষা অনুসারে আগে নাম, পরে বীজ—এভাবেও দীক্ষা হয়েছে।

১৯৭৮ সালের জানুয়ারী মাসের কথা। মা বারান্দায় বসেছিলেন। এক ভদ্রমহিলা প্রশ্ন করলেন, "মা, মন কী করে শান্ত হবে ?"

মা—"ভগবানের নাম কর।"

ভদ্রমহিলা—"কী নাম করব ?"

মা—"তোমার যা ভাল লাগে।"

ভদ্রমহিলা—"আমি জানি না, আমি তো সকলকে ডাকি।"

মা "রাত্রে চিন্তা করে শোবে। সকালে উঠে প্রথমে যাকে মনে হবে তাকে ডাকবে। নমস্কার করবে।"

সেদিন বিকালে একটি ছোট মেয়েকে মা বলছিলেন, "ভগবানের নাম কর। কালী কালী, দুর্গা দুর্গা, শিব শিব, রাম রাম বল।" মা নিজেও বলছিলেন এবং মেয়েটিকেও বলাচ্ছিলেন।

আনুষ্ঠানিক দীক্ষা ছাড়াও মা যে কতভাবে নাম বিলিয়েছেন ও দীক্ষা দিয়েছেন, তার ইয়ত্তা নেই। দীক্ষা সম্পন্ন হ'য়ে গেলে নবদীক্ষিত-দের মা কিছু সংক্ষিপ্ত সারগর্ভ উপদেশ দিতেন। একদিন দীক্ষাপ্রসঙ্গে মা বললেন, "শব্দ ব্রহ্ম—প্রণব আছে না ? তার মধ্য দিয়ে সহস্রারে পৌঁছে নিরাকার ব্রহ্মে পৌঁছে যাওয়া। মা, যিনি মেপে দেন, তাঁরই তো আশ্রয়ে আছ। তাঁর কাছে যাওয়ার চেষ্টা। পূজা করতে ইচ্ছা হলে বলা। বীজ ও গুরুমন্ত্র দিয়ে পূজা করা।"

কাশীর আশ্রমে একবার নবদীক্ষিতগণের প্রতি মা এই উপদেশ দিয়েছিলেন—

"এখানে মহাদেব স্বয়ং দীক্ষা দেন। দীক্ষার বিষয়ে কাউকে কিছু না বলা ..। ভগবান্ স্বয়ং আপনাতে আপনি লীলা করছেন। জ্ঞানস্বরূপ, আত্মস্বরূপ প্রত্যক্ষ করার জন্য দীক্ষা। যে লাইনে যার ইচ্ছা যাক্। যেমন কেউ রেলে, কেউ মোটরে যায়। যে যে পথে যায়, তাই ঠিক। ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য যে রূপে প্রকাশ হয়, তাই ঠিক। গৃহস্থ ঘরে বসে তপস্যা করলে, তাই কুটির। ... দীক্ষা মানে পুনর্জীবন।"

আরও একবার মাকে নিম্নলিখিত উপদেশ দিতে শুনেছিলাম।

"অখণ্ড ধ্বনি চলছে। ঋষিমুনিরা শুনতে পায়। কানে হাত দিয়ে বুঝতে পারা যায় ধ্বনি চলছে। জগৎ গতি, জীব বন্ধন—কল্পনা মাত্র জগৎ সৃষ্টি। মন ত্রাণ হওয়ার জন্য মন্ত্র। মুহূর্তের মধ্যে যা মনে হয় তা বদলে যায়। জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়ার জন্য প্রার্থনা -হে ভগবান্, তুমি আমার আশ্রয়, তুমি আমাতে প্রকাশ হও, ঠাকুর।"

কুমারীর উপনয়ন

ব্রাহ্মণকুমারীর উপনয়ন সংস্কার ও নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্যে দীক্ষা মায়ের খেয়াল-লীলার এক অভিনব প্রকাশ। শ্রীশ্রীমায়ের নিজ জীবনেই এর সূত্রপাত হয়েছিল যেদিন তাঁর স্বর্ণ হারটি অকস্মাৎ উপবীতের আকারে তাঁর শ্রীঅঙ্গ বেষ্টন করে। সেদিন মা নবদুর্গার অন্যতম রূপ ব্রহ্মচারিণী রূপে প্রকট হ'য়েছিলেন। সেই থেকে শুরু হল সুযোগ্য কুমারীগণের উপনয়নের পালা। ব্রহ্মচারিণী গুরুপ্রিয়া দেবী (আমাদের দাদাভাই) এবং মরণীদি সর্বপ্রথম মায়ের খেয়ালে উপবীত ধারণ করে নৈষ্ঠিক ব্রহ্ম-চর্যে দীক্ষিত হন। মেয়েদের পৈতায় অধিকার আছে বলে আমরা সচরাচর জানতাম না, কিন্তু মায়ের খেয়ালকে অবলম্বন করে যখন যা' সহজভাবে প্রকাশ পেয়েছে, পরে দেখা গেছে তা' শাস্ত্রমতের সঙ্গে সুন্দর-ভাবে মিলে যাচ্ছে। এখানেও ব্যতিক্রম হয়নি। কাশীর স্বনামধন্য শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ বেদ ও পুরাণ থেকে দৃষ্টান্ত তুলে ধরে প্রমাণ করেছেন যে প্রাচীন ভারতে ব্রহ্মচারিণীর উপনয়নের বিধান ছিল। উপরন্তু মা স্বয়ং বেদ প্রকাশিকা, তাঁর বাণী সমস্ত শাস্ত্রের সার; মায়ের আদেশ-নির্দেশ বা খেয়াল শাস্ত্রসম্মত কিনা তা শাস্ত্র ঘেঁটে দেখবার প্রয়োজন নেই—এ কথা বলেছেন মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়।

মায়ের অসীম অনুকম্পা বশতঃ আমরা কন্যাপীঠের গুটিকয়েক

মেয়েরা পৈতা ধারণের সৌভাগ্য লাভ করেছি। ১৯৭১ সালে চন্দনদি ও গীতার উপনয়ন হয়।

৫ই জুন, ১৯৭৩ সাল

আশ্রম প্রাঙ্গণে সাতজন ব্রাহ্মণ কুমারের একত্র উপনয়ন সংস্কার সম্পন্ন হল শ্রীশ্রীমায়ের উপস্থিতিতে। তাদের মধ্যে দু'জন বিদ্যাপীঠের ছেলে, দু'টি রায়পুর থেকে আগত একটি বেরেলীর, একটি কলকাতার এবং সপ্তম জন তারাদির ছেলে। এদের সঙ্গে মা দয়া করে আমারও উপনয়ন সংস্কার করালেন। চুল কেটে গেরুয়া বসন ধারণ করার পর মা বল্লেন, "বেশ সুন্দর লাগছে। গেরুয়া চেয়েছিলে, এই তো পেয়েছ।" দাদা-ভাই মন্ত্র দিলেন। মা প্রথম ভিক্ষা দিলেন, তারপর দাদাভাই। তিন-দিন ঘরে থাকলাম নিয়ম মতন। মা দু'দিন আমাদের দেখতে এসেছিলেন। একদিন আমি মায়ের কাছে অনেকক্ষণ বসেছিলাম। স্বয়ং গায়ত্রীস্বরূপিণী, মন্ত্রবীজাত্মিকা মা আমাদের কল্যাণার্থে প্রথম ব্রহ্মচর্য জীবনের নিভৃত কোণে আমাদের সঙ্গে বসে কতই-না মধুঝরা উপদেশ দিয়েছিলেন।

চতুর্থ দিন ভোর চারটের সময় গঙ্গাজলে দণ্ড ভাসিয়ে ফিরে এসে মাকে প্রণাম করতে গেলাম। মা বললেন, "তোমরা এখন দ্বিজ। তোমাদের দু'বার জন্ম হল, একবার মা'র গর্ভ হতে, আর এখন পৈতা নিয়ে।"

তারপর সন্ধ্যা ও হোম করে আমরা মায়ের সঙ্গে ফটো ওঠালাম।

মায়ের শাসন বড় মিষ্টি। তার আদিতে ও অনন্ত ক্ষমা। সর্বশক্তিময়ী মা যদি ক্ষমা না করেন, তাহ'লে প্রলয় হয়ে যাবে। কিন্তু অনুশাসনের জন্য, শোধনের জন্য, শিক্ষার জন্য শাসন আবশ্যক। মা তাই দেখিয়েছেন।

কোনো মেয়ে অবাধ্যতা করলে যদি মাকে সে বিষয়ে বলা হত, মা

তাদের ডেকে বুঝিয়ে দিতেন, সঙ্গে সঙ্গে বড়দেরও বলতেন ধৈর্য ধরে কুমারী সেবা করতে। দু'চারটি মেয়ের দুষ্টামীর কথা শুনে মা একবার আমাদের বলেছিলেন, "শোন্, ভাব্‌বি যে এরা যেমন সংস্কার নিয়ে এসেছে, তেমনিই হবে। ভগবান্ তুমি এইরূপে এসেছ, তুমি সেবা করার সুযোগ দিয়েছ। এদের কথায় মন খারাপ করবি না। খারাপকে ভাল করতে পারলে, ধৈর্য সহ দেখাশুনা করতে পারলে, তাই তপস্যা / জপের থেকেও এতে বেশি ফল।"

যারা দোষ করে ফেলে তাদের সংশোধনের জন্য মা শাস্তির বিধান দিয়েছেন। কেউ কোন দোষ করলে মা বলতেন তাকে দিয়ে জপ করাতে। জপের একটি সংখ্যা দিতেন, কাউকে হাজার, কাউকে দু'হাজার, এই রকম। ছোট মেয়েদের বলতেন জোরে জোরে দশবার বা একশবার রাম নাম বা অন্য কোন নাম করতে। যার উপর শাসনের ভার, সে যেন অন্যায়কারীর প্রতি ক্রোধ বা ঘৃণা না করে। শাস্তি দেবার সময় মনে মনে বলে, "ভগবান্, তুমি এইরূপে এসেছ, এইরূপে সেবা নিচ্ছ।" আবার যাকে তার অপরাধের জন্য শাস্তি দেওয়া হল, সেও যেন ভাবে, "ভগবান্, তুমি এইরূপে (শাস্তি রূপে) এসেছ।"

১৯৭৫ সালের ২০শে ডিসেম্বর

মাকে একদিন বললাম যে ছোট মেয়েদের কেউ কেউ নিজেদের গরম জামা গুছিয়ে রাখে না, পরিস্কার জামা মাটিতে ফেলে নোংরা করে।

মা বললেন, "যে মাটিতে জামা ফেলে ময়লা করবে, তাকে কান ধরে ওঠা বসা করাবে আর জপ করাবে।"

২১শে এপ্রিল, ১৯৮০

আজ মা কান্তিজীকে মেয়েদের আচার আচরণের কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন। হিন্দীতে কথাবার্তা হচ্ছিল।

মা—"কোন্ কোন্ মেয়ে আছে যারা সকলকে সম্মান করে ও সবার কথা শোনে ?"

কান্তিজী—"সবাই চেষ্টা করছে।"

মা—"কাহারও দ্বারা দোষ হলে বড়দের তো তাকে বলা উচিত। তাদের বলা, মা-বাবা ভাল শিক্ষার জন্য এখানে পাঠিয়েছেন। যদি তোমরা দোষ কর, তবে সেই দোষ মা-বাবার উপর আসবে। যে মিথ্যা কথা বলবে তাকে ১৫ মিনিট এক পায়ে দাঁড় করিয়ে রাখবে। সুশিক্ষার জন্য এতটুকু করতে হবে।"

১৯৬৩ সনের ২০শে জুন

অসহ্য গরম ছিল। রাজগীরে মায়ের সঙ্গে অনেকদিন ছিলাম। সঙ্গে সতীদি, বিশুদ্ধাদি, দয়ানন্দজী, বিমলাদি ও লক্ষ্মীজী ছিলেন। মা এবং সকলের রান্না করতাম, মাকে খাওয়াতাম, মার সঙ্গে বিকালে বেড়াতে যেতাম। মা মোটরে বসে পাহাড়, পর্বত, নদী, মন্দির ও অন্যান্য দর্শনীয় বস্তু আমাদের দেখাতেন। মায়ের আমাদের প্রতি সর্বদা সজাগ দৃষ্টি থাকত। আমাদের আচার ব্যবহারে ত্রুটি হোক্ মা চাইতেন না। একদিন সকালে মা আমাকে কাপড় পরা শেখালেন এবং বকুনিও দিলেন। মায়ের কাছে প্রথম এত বকুনি খেয়ে মন খারাপ হল, তবুও মায়ের রান্না ও সব লোকেদের রান্না করলাম। সেদিন আমি খাই নাই। মাও ১টা বেজে গেছে খান নাই, কারণ মার খুব হাতে ব্যথা ছিল। মা শুনেছেন আমার না খাওয়ার কথা। বলে পাঠিয়েছেন, "জয়া না খেলে আমি খাব না।" তখন একটু কিছু মুখে দিয়ে মাকে খাওয়ালাম। মা বললেন, "বন্ধুকে আজ এত বকেছি, তবু এত আদর করে খাওয়াল, এত ভাল রান্না হয়েছে, কি বলব।" আমাদের আশ্রমের খেতের অড়হর ডাল ছিল, আম দিয়ে ডাল বানিয়েছিলাম। মাকে খুব বড় গ্রাস করে খাওয়ালাম। মা বল্লেন, "তোকে

কে শিখিয়েছে এরকম খাওয়াতে।" আমি বল্লাম, "বিশুদ্ধাদি শিখিয়েছে।" মা বিশুদ্ধাদিকে বল্লেন, "তোকে কে শিখিয়েছে?" বিশুদ্ধাদি বললেন, "আমাকে দাদাভাই শিখিয়েছেন।" আমি বল্লাম, "মা, আরও কিছু দেব।" মা—"কি বলছিস্! দয়ানন্দ থাকলে বলত মার আজ কি হল?" মায়ের এত স্নেহ ভরা কথা আজও ভুলবার নয়।

১৯৭৩ সালের ৪ঠা এপ্রিল

মেয়েদের নামে একটি নালিশ মায়ের কাছে এসেছিল। গীতাকে ডেকে মা বললেন, "কে একথা বলেছে যে মা ছোটদের শাস্তি দেন, বড়দের দেন না? জিজ্ঞাসা করে এস।" খোঁজ নেওয়ায় কন্যাপীঠের দুটো ছোট মেয়ে মীনা ও সীতা স্বীকার করলো যে তারা বলেছে। মা বললেন, "তোমরা একথা বলেছ, তারজন্য আমি কি শাস্তি দেব? তোমরা বলে দাও।" মীনা ও সীতা যথাক্রমে বলল তারা এক হাজার ও পাঁচ হাজার জপ করবে। মা সীতাকে বললেন তিন হাজার জপ করতে। মা তাদের বুঝিয়ে বললেন, "তোমরা কেউ কারুর আলোচনা করবে না। বড় মেয়েরা যে আমার কাছে থাকে আমি তাদেরও এক এক জনকে এক এক কথা বলি। যাকে যে কথা বলা দরকার, সেই কথাই বলা হয়।"

মা বড় মেয়েদের বললেন, "তোমরা কুমারী সেবা করছ। কুমারী হল ভগবতীর রূপ। শাস্তি দেওয়া মানে, তোমরা ভাববে, 'ভগবান্ এইরূপে এসেছে, এই ভাবেই সেবা করতে হবে।' তোমরা এই শরীরের কাছে এসেছ কত দূর দূর থেকে। এ শরীরের কাছে এসে তোমরা এরকম হবে কেন? কাশীতে গঙ্গার তটে তোমরা আছ, সেখানে জপ করলে দশগুণ ফল হয়। সেই পথের যাত্রী তোমরা।"

আজ মা আমাকে দিয়ে লেখালেন, "সকাল বেলা ছোটরা হাতজোর করে প্রণাম করবে। তারা বলবে, "শক্তিরূপা মা, আমরা আদেশ

পালন করব।" বড়রা বলবে, "কুমারীগণ, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি, ভগবান্ কৃপা করুন, সত্যে প্রতিষ্ঠিত রাখুন।"

প্রত্যেকটি কাজ নিখুঁত ও পরিপাটি সহকারে করলে মা খুশী হতেন। অগোছাল কাজ করলে মা সঙ্গে সঙ্গে টুকতেন। শরীর-মন এলোমেলো থাকলে কাজকর্মও এলোমেলো হয়। শরীর যদি সুস্থ ও কর্মপটু হয়, মন যদি শান্ত ও ধৈর্যশীল হয়, চরিত্র যদি দায়িত্বজ্ঞানযুক্ত, নিপুণ ও নিরলস হয়, তবে ছোট বড় প্রতিটি কাজ সুন্দরভাবে হয়ে থাকে। আমাদের শিক্ষা দেবার জন্য মা সর্বদা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখতেন আমরা কখন কি করি, কি ভাবে করি। কতবার দেখেছি, মা আসবেন বলে আমরা ঘরদোর খুব পরিষ্কার করলাম, যথাসাধ্য সাজিয়ে গুছিয়ে রাখলাম, আর মা এসে আমাদের সাথে দেখা করে কুশল সংবাদ নিয়ে সোজা চলে গেলেন ঠিক সেই স্থানটিতে যেখানে আমাদের অবহেলার চিহ্ন ছড়িয়ে রয়েছে, বা মা এখানে আসবেন না মনে করে যেখানে আবর্জনা জড়ো করে রাখা হয়েছে। মায়ের দৃষ্টি যে সর্বত্র প্রসারিত, মায়ের গতি যে সর্বত্র।

১৯৭৪ সনের ১৬ই জুলাই

মাকে আমি রান্না করে খাওয়ালাম। সেদিন শ্রীহরীশ ব্যানার্জীর স্ত্রী সাবিত্রীদি কিছু রান্না করে মাকে নিজে হাতে খাইয়েছিলেন কাজেই মা খুব কম খেয়েছেন। মা বল্লেন, "পেট তো ভরেই গেছে, কি আর খাব।" তবুও কৃপা করে আমার রান্না মা খেলেন।

সেদিন রাত্রে মা আমাদের সাথে অনেক কথা বল্লেন। মা বল্লেন, 'তোমরা সেবা করবে ভাল করে, আলস্য ত্যাগ করবে। তোমরা পদ চাও, তার জন্য মিলেমিশে থাকতে পার না? ভাল ভাবে শান্ত ভাবে কথা বলবে। জোরে কথা বলবে না। পুরুষের সামনে ঝগড়া কর, তোমাদের লজ্জা করে না ? তোমরা ঝগড়া করবে কেন? এত আরামে থাক,

তবুও ঠিক হয়ে থাকতে পার না? বীথু পদ্মারও তোমরা বদনাম করে দেবে।"

মা অনেক ধমকালেন এবং ভাল কথাও বল্লেন। প্রায় রাত্রি সাড়ে বারোটা বেজে গেল মার সাথে কথা বলতে বলতে।

কোন কারণে এই রকম মার কাছে বকুনি খেয়ে মন খুবই খারাপ হয়ে গেল।

এই জাতীয় কত ভাবেই মা আমাদের কৃপা করছেন, কিন্তু আমাদের সংস্কার এত প্রবল যে কিছুতেই আমরা এ পথের যোগ্য হতে পারি না।

১৯৭৬ সালের ২০শে অক্টোবর

মা কনখল থেকে কাশী এসেছেন। মায়ের ভোগ প্রস্তুত। কিন্তু মাকে ডেকে আনতে দেরি হচ্ছে। শেষে কাউকে কিছু না বলে মা নিজেই রান্নাঘরে গিয়ে হাজির। বললেন, "দে, খেতে দে। তোরা তো দিবি না, তাই আমিই এসে গেলাম।" রান্নাঘরে সব জিনিষ এলোমেলো ছিল। মা বললেন, "ছি ছি, এত নোংরা ঘর। এত ছিটিয়ে বসেছিস?" দাদাভাইকে বললেন, "দিদি, আর পারি না, এদের দিয়ে হবে না।"

আমাদের কল্যাণের জন্যই মায়ের এই ভর্ৎসনা বাণী। পরক্ষণেই আমাদের সমস্ত লজ্জা ভয় মা হাল্‌কা করে দিতেন তাঁর স্নেহ-মাখান দু'চারটি কথা দিয়ে। কখনও বা আদর করে আমাদের অনুতাপ গ্লানি মুছিয়ে দিতেন। সেদিনও ব্যতিক্রম হল না। খেতে বসে মা আমাদের রান্নার প্রশংসা করতে লাগলেন।

১৯৭৬ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী

সরস্বতী পূজা আগতপ্রায়। মা এসেছেন। মায়ের আদেশে গীতা সরস্বতী পূজা করবে। মা আমাকে দিয়েছেন মূর্তি প্রতিষ্ঠার ভার।

অবনীদাকে ডেকে মা বললেন, "তুমি পূজা করিয়ে দিও।" পানুদা আমাকে পূজা সামগ্রীর ফর্দ দিলেন। আমি ফর্দ পড়ে বললাম, "চূর্ণ আর ভস্ম—এতে আবার কি তফাৎ ?"

আমার কথা শুনে মা বললেন, "তুমি আচার্য, তুমি জাননা ? আবার জিজ্ঞেস্ করছ ?"

আমি কিছু বলতে যাচ্ছিলাম। মা বললেন, "তর্ক করছ ? দেখ এদের কি স্বভাব !"

নিজের অপরাধ স্বীকার করে নিলে মা যেমন খুশি হতেন, তেমনি নিজের অপরাধ ঢাকবার চেষ্টায় তর্ক করলে মায়ের কাছে বকুনি খেতে হত।

শিষ্টাচার বিরোধী কোন আচরণ মা পছন্দ করতেন না। যেমন, অন্যের কথার মধ্যে কথা বলে ফেললে মায়ের বকুনি খেয়েছি। শাস্ত্রীয় বিধান না মেনে খেয়াল খুশি মত কাজও মা পছন্দ করতেন না।

১৯৭৬ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী

উপরি-উক্ত সরস্বতী পূজার পরে সরস্বতী মূর্তিটি বিসর্জন না দিয়ে রেখে দেওয়া হয়।

মা সেকথা শুনে পানুদাকে ডেকে বললেন, "তুমি কেন রেখেছ ? মেয়েদের কথা কেন শুনলে ? সরস্বতী মূর্তি রাখতে নেই, লক্ষ্মী প্রতিমা রাখা যায়। কাল সকালেই বিসর্জন দিয়ে দেবে।"

সেদিন রাত্রে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে দাদাভাই-এর ঘরে গেলাম। দাদাভাই-এর শরীর অসুস্থ থাকায় মা দাদাভাই-এর ঘরে ছিলেন। মেয়েদের জন্য গরম জামা এসেছে। মাকে দেখানো হল। মা দাদা-ভাইকে জিজ্ঞেস্ করলেন, "তোমাদের এখানে ক'টি মেয়ে ?"

আমি বললাম, "তিরিশটি।"

মা বললেন, "তোমাকে কে জিজ্ঞাসা করেছে? বেশি বেশি কথা বলতে শুরু করেছ।"

শুতে যাওয়ার আগে মা আমায় খুব আদর করে বললেন, "কাল থেকে দু'দিন তো খুব বেশি কাজ। সব সামলাতে হবে।"

পরমপ্রাপ্তিই জীবনের লক্ষ্য। নানা অবস্থার মধ্য দিয়ে সেদিকেই এগিয়ে চলতে হবে। কন্যাপীঠের ব্রহ্মচারিণীদের মা বারংবার সচেতন করিয়ে দিতেন যে অধ্যয়ন-অধ্যাপনকে সাধন-ভজনের অনুকূল ক্রিয়ারূপে গ্রহণ করা হয়েছে, আমরা যেন গৌণকে মুখ্যভূমিকা না দেই। আমাদের লক্ষ্য যেন উপলক্ষ্য মাত্র হয়ে না যায়।

আমার ইচ্ছা ছিল গবেষণা করার। ১৯৭০ সালের জুলাই মাসে মা যখন কাশীতে ছিলেন, মাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস্ করেছিলাম। মা নিষেধ করলেন। বললেন, "এই পথে মান-অপমান ত্যাগ করতে হবে।" শুধুই ডিগ্রী লাভের দ্বারা মান সম্মান বৃদ্ধির উচ্চাকাঙ্খা নিয়ে লেখাপড়া করায় যে বাস্তবিক জ্ঞানবিদ্যা লাভ হয় না মা সে কথাই বুঝিয়েছিলেন। অবশ্য প্রত্যেকের সাধনের অনুকূল রুচি, ক্ষমতা ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার দিকে দৃষ্টি রেখে মা উপদেশ ও আদেশ দিতেন। ম্যানেঞ্জাইটিসে দীর্ঘদিন ভুগে ওঠার পর মাথার খুব বেশী পরিশ্রম আমার স্বাস্থ্যের অনুকূল ছিল না। পরবর্তী বছরগুলিতেও নানারকম দীর্ঘস্থায়ী অসুখে ভুগি। মা তো অন্তর্যামী। গবেষণার কাজ হাতে নিলে অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে শারীরিক ও মানসিক ক্লেশের সম্ভাবনা ছিল, আমার জীবনের দিক্ ধারা থেকে সরে আসার ভয় ছিল, তাই বোধ হয় মা মান-অপমান ত্যাগ করে আমায় নির্দিষ্ট পথে অগ্রসর হতে বলেছিলেন।

১৯৭৭ সালের ৪ঠা নভেম্বর

মা কাশীতে রয়েছেন। আমি সকালে মাকে জলখাবার খাওয়াচ্ছিলাম। মা হঠাৎ বললেন, "তুমি ক'বছর পড়াচ্ছ?"

আমি বললাম, "ছ'বছর"।

তখন মা এই কথা ইঙ্গিতে বোঝালেন, যে যখন ছোট মেয়েরা শিক্ষালাভ করে আমাদের জায়গায় শিক্ষয়িত্রীর কাজ করতে পারবে, তখন আমাদের উচিত হবে পরাবিদ্যার সাধনায় সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করা। মা খুব হেসে হেসে বললেন, "এই পড়া তো হ'ল। এরপর ওদিকটাও তো করতে হবে। চন্দনের (ব্রঃ চন্দন পুরাণাচার্য) মতই তোমরাও বসবে (ঈশ্বর-আরাধনায়)।"

কখন কখন দেখে আশ্চর্য হত, মা কেমন করে সমস্ত শাস্ত্রের খুঁটিনাটি সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর কথা জানেন। পরক্ষণেই মনে হত, মা-ই তো সমস্ত শাস্ত্রের উৎস। একদিন আমি মাকে খাওয়াতে গেছি। ঠিকভাবে না দাঁড়ানোর ফলে ডান দিকে হাত ঘুরিয়ে মাকে খাওয়াচ্ছিলাম। মা বললেন, "এ দিক্ দিয়ে খাওয়াচ্ছিস্ কেন ?" তারপর দাদাভাইকে বললেন, "পিতৃপুরুষকে এমনি করে জল দেয়।" আমি নিজের ভুল বুঝতে পারলাম।

শুধু ব্যক্তিগত সুবিধা বা আরামের জন্য শাস্ত্রবিধি বা প্রচলিত মর্যাদা উল্লঙ্ঘন করা হ'লে দেখেছি মা টুকে দিতেন। একদিনের কথা। মা সন্ধ্যাবেলা অন্নপূর্ণা মন্দিরে এসে বসেছেন। আরতি আরম্ভ হবে। মায়ের দিব্য উপস্থিতিতে মা অন্নপূর্ণার সান্ধ্য আরত্রিক দেখার জন্য বেশ কিছু ভক্ত সমাগম হয়েছে। নারায়ণ স্বামীজী দর্শনার্থীদের বললেন, "আপনারা কেউ উঠে দাঁড়াবেন না, তাহলে আরতি দেখা যাবে না।" মা তৎক্ষণাৎ বললেন, "কেন, আরতি হবে, দাঁড়াবে না ? আমিও দাঁড়াব।" এই কথা বলে মা নিজেও দাঁড়িয়ে পড়লেন। অতএব সকলেই দাঁড়িয়ে আরতি দেখলেন।

আরতির পর মা বললেন, "আমি বসলাম। বসা তো হয় না, একটু বসি।" অবনীদার সঙ্গে কিছু কথা ছিল, তাই মা বসে রইলেন।

অবনীদা জপ করে রাত দশটার সময় এসে দেখেন মা তাঁর জন্যে বসে অপেক্ষা করছেন। মা যে অপেক্ষা করছেন, খেয়াল ছিল না। অবনীদা খুব দুঃখ করতে লাগলেন। বললেন, "মা, আমার এত দুঃসাহস, আপনাকে বসিয়ে রাখলাম?" ইত্যাদি।

মা বললেন, "চুপ কর, ওসব কথা থাক্।"

মা কত অনায়াসে অবলীলাক্রমে সংক্ষিপ্ত ভাষায় আমাদের ভুল দোষ ক্ষমা করে দিতেন, তার নিদর্শন আমাদের স্মৃতির ভাণ্ডারে ভরা আছে। নিজের দোষ ত্রুটি স্বীকার করলেই মা সন্তুষ্ট হতেন, কারণ নিজে যখন কেউ নিজের দোষ বুঝতে পারে, তখনই তো সংশোধন সম্ভব হয়।

১৯৭৬ সালের ২০শে আগষ্ট

মা বিন্ধ্যাচলে যাচ্ছেন অজ্ঞাতবাসে। মা যখন বিশ্রামার্থে কোথাও গিয়ে অজ্ঞাতবাস করতেন, নিয়ম ছিল মায়ের বাসস্থানের কথা গোপন রাখা, প্রচার না করা। এবারে সে গোপন খবর আমরা জেনে গিয়েছিলাম। আরও জানতে পেরেছিলাম, মা আজকে বেনারস ষ্টেশন পার করে বিন্ধ্যাচল যাচ্ছেন। আর কি চাই? আমরা সকলে মিলে ষ্টেশনে পৌঁছে গেলাম। যথাসময়ে মায়ের গাড়ী প্লাটফর্মে এল। আমরা বেশ কিছু জন দল বেঁধে দাঁড়িয়েছিলাম। মায়ের কামরায় গিয়ে মাকে প্রণাম করলাম। মা সাবিত্রীদি ও সমুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কার কাছে খবর পেয়েছ?" সমু বলল, "আমি আশ্রমে ফোন করে খবর পেয়েছি।" পানুদা বললেন, "...কেউ বলে দিয়েছে, মা বিন্ধ্যাচলে যাচ্ছেন।" মা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "সে বিশেষ অন্যায় করেছে এই শরীরটার উপর।" দু'বার বললেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, "এ শরীর একটু একান্তে বিশ্রাম করবে, তাও হবে না? তোমরা কি জান এ শরীর কোথায় যাবে?"

আমরা চুপ করে রইলাম। মা বললেন, "যদি কেউ যায় এবং

কান্নাকাটিও করে, তবুও দেখা হবে কিনা বলতে পারি না। ওপরের দরজা বন্ধ থাকবে।"

পানুদা বললেন, "আমিই ষ্টেশনে আসার খবর দিয়েছিলাম।" তখন মা বললেন, "ঠিক আছে জয়া, কিছু আর বোলো না। সে ন্যায়ই করেছে। সবাইকে আসতে বলেছে, ন্যায়ই করেছে। অন্যায় কিছু করে নি। ভালই তো করেছে।"

"এ শরীর একটি ভাবের পুতুল,
তোমরা চেয়েছ তাই পেয়েছ।"
—শ্রীশ্রীমা

দুই

মায়ের করুণা ও স্নেহ

দুই

মায়ের করুণা ও স্নেহ

শ্রীশ্রীমা মহাকরুণার স্রোতোধারা। যে সৎস্বরূপ, চিৎস্বরূপ পরব্রহ্ম অদ্বৈতভূমিতে "আনন্দম্", দ্বৈতভূমিতে তাঁরই লীলাবিলাস হয় করুণা রূপে। শ্রীশ্রীমায়ের আনন্দময়ী মূর্তিটি তাঁর মহাকরুণার কেন্দ্রে অবস্থিত—তিনি যে দৃশ্যমান্ রূপে আমাদের কাছে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, তার মূলে রয়েছে একমাত্র তাঁর অনন্ত, অবর্ণনীয় করুণা। "মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্"। করুণাময়ী মায়ের সব কিছুই করুণাময়। তাঁর কথায় করুণা, তাঁর মৌনে করুণা, তাঁর আদরে করুণা, তাঁর দণ্ড দানেও করুণা। তাই কেমন করে বলি, শুধু অমুক-অমুক ঘটনায় তাঁর করুণার প্রকাশ দেখেছি? তবুও, মায়ের কথা বলতে গেলে তাঁর করুণার কথা অবশ্যই বলতে হয়, আর পুস্তকের আকার মনে রেখে মাত্র ক'একটি ঘটনার কথাই লিখতে হয়। আমার রোজনামচার কিছু অংশ তুলে ধরছি।

মা যে কত করুণা করে আমাদের প্রত্যেকের জীবনটিকে নিজ হাতে গড়েছেন, আমাদের জীবনের ধারাকে চৈতন্য জাগরণের পথে প্রবাহিত করেছেন, তা আমরা সম্পূর্ণরূপে ধারণাই করতে পারিনা। আমাদের চিত্তে যে সব মায়ামোহের মলিনতা রয়েছে, তা আমাদেরই দোষে। তবু মায়ের কল্যাণ হস্তের স্পর্শ যে আমরা সারা জীবন মস্তকে বহন করছি, তাতেই আমরা ধন্য।

১৯৫৭ সালের ৬ই মে

বাসন্তী পূজার ষষ্ঠী তিথি। কন্যাপীঠের এক দিদির সাথে সেদিন

মায়ের যে কথোপকথন হয়েছিল, তা সেই দিদিরই ভাষায় এখানে লিখছি।

মা আমাকে দুপুর বেলা খাওয়ার সময় ডেকে পাঠালেন। আমি মায়ের কাছে গেলাম।

মা বললেন, "তুই পঞ্চগব্য খেয়েছিস্?"

আমি—"না।"

মা—"কত জপ করেছিস্? ফাঁকি দিস্ না।"

আমি—"মা, ঠিক নাই। সংখ্যা রেখে করি নাই।"

মা—"আন্দাজ কত?"

আমি—"আধ ঘণ্টা কোন দিন, ১০-১৫ মিনিট কোন দিন।"

মা—"এই যে জানি না, কোনো ইণ্টারেষ্ট নেই, মন নেই, একটা উপেক্ষার ভাব—এটাও এক রকম ফাঁকি, তাই না?"

আমি—"হ্যাঁ, মা।"

মা—"এই তো বুঝেছ, লক্ষ্মী মেয়ে। ভুলটা স্বীকার করলেই তো ভাল।"

সেদিন রাত্রে আমি মাকে বললাম, "মা, তোমার সঙ্গে কথা আছে। মা বললেন, "বেশ, আমি যখন উপরের ঘরে যাব, তখন তুমি যেও।"

আমি মার ঘরে ঢুকতেই মা বললেন, "বাঃ, তুই তো বেশ সুন্দর গান করিস্। আমি তো জানতাম না!"

আমি বললাম, "মা, তুমি যে জপের কথা বলেছিলে, আমি কখনও কোন ঠিক সংখ্যা রেখে জপ করি নাই। তুমি যে দ্বাদশ অক্ষর মন্ত্র দিয়েছিলে, সেই মন্ত্র একদিন ৩০০র বেশী করার চেষ্টা করেছিলাম, তবে ঠিক সংখ্যা মনে নেই। রোজ ইষ্টমন্ত্র দুই হাজার করি।"

মা—"বেশ তো! রোজ দুই হাজার করিস। কাল সকালে গঙ্গায় মন্ত্রস্নান করে সারাদিন যখন হয় আট হাজার জপ আরো করিস। আর

কালকে যে পূজা হবে,—দেবীর স্নান করা জলে সব কিছু থাকে, মহাস্নান কিনা,—সেই জল খেয়ে নিস্, আর পঞ্চগব্য খাওয়ার দরকার হবে না।"

আমি—"মা, জপের একটা নির্দিষ্ট সংখ্যা বলে দাও না।"

মা—"রোজ সকাল, বিকাল ইষ্টমন্ত্র ১০৮ বার তো করবেই, আর তাছাড়া এক মাসে হোক্, দু'তিন মাসে হোক্, একলাখ জপ করবে। যে সময় যে রকম পারবে, করবে।"

আমি—"মা, মনটা ঠিক করে দাও না।"

মা—"কি মনে হয় ?"

আমি—"যেমন, মাঝে মাঝে মনে হয় আমি এই যে আশ্রমে এসেছি, আমার কি উন্নতি হল ?"

মা—"সাত্ত্বিক, পারমার্থিক জীবন নিয়েছ। ইচ্ছায়, অনিচ্ছায় কীর্তন, পাঠ কানে যায়। এতেও কাজ হয়।"

আমি—"মা, সময় সময় ধ্যান করতে খুব ভাল লাগে।"

মা—"এই তো ! তবে ?"

আমি—"মা, কাজ করতে ইচ্ছা করে না। কাজ করলে পর মনটা ভাল লাগে। কোন সময় কাজ করতেও ভাল লাগে, কিন্তু বেশির ভাগ সময় ভাল লাগে না। কেন এমন হয় ?"

মা—"হ্যাঁ এটা আলস্যের জন্য। এই সময় এই রকম একটা ভাব আসে। কাজকে কেন ভয় পাবি ? ভাববি, "কাজ আমাকে ভয় পাবে। কাজ করে করে কাজকে খেয়ে ফেলবো। কাজ আমার কী করবে ?"

আমি—"মা, আলস্য কি করে যাবে ?"

মা—"জপেই যাবে। বেশ মন দিয়ে লেখা-পড়া কর। দিদির ইচ্ছা, তোমরা দাঁড়াও। সব দেখাশুনা করবে। বেশ ভাল করে মনটাকে দৃঢ় করবে, সংযত করবে।"

মায়ের কৃপা ভুক্তিমুক্তি প্রদায়িণী। মায়ের কৃপা কল্পতরু। কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্রী, ইন্দ্রাণী চক্রবর্ত্তী, কন্যাপীঠে সেতার শেখাত। একদিন ইন্দ্রাণী মাকে সেতার বাজিয়ে শোনাল। মা শুনে খুশি হলেন। সে মাকে বলল, "আমি সঙ্গীতে বড় হতে চাই।" মা এই কথা শুনে হেসে বললেন, "এতটা যখন শিখেছ ভগবানের কৃপায় তখন আরও শিখে যাবে।"

আজ সেই ইন্দ্রাণী সিমলা ইন্‌ষ্টিট্যুটে সঙ্গীত বিভাগের প্রধান। সে সঙ্গীত বিষয়ে গবেষণামূলক অনেক বই লিখে খুব নাম করেছে। রেডিওতে এবং টি, ভি তে প্রায়ই প্রোগ্রাম দেয়। খুব অল্প বয়সে মায়ের কৃপায় নিজ বিষয়ে প্রভূত উন্নতি লাভ করেছে।

১৯৬১ সালের ১২ই জুন

শরণাগতবৎসলা মা। মায়ের উপর সত্য সত্যই সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারলে যে বিপদ্‌-আপদ্‌ কেটে যায়, অনেকবার তা' স্বচক্ষে দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। একবারকার কথা। মা তখন পুণায়। হঠাৎ প্রবল বেগে বর্ষা নামলো। দেখতে দেখতে মাঠঘাট ভরে গেলো। ভাণ্ডারা হবার কথা, অথচ ঠিক তার আগের দিন খবর পাওয়া গেলো, বর্ষার জল হু হু করে বাড়ছে। প্রশাসনিক বিভাগ থেকে সতর্ক করে দেওয়া হতে লাগলো। প্রকাশদা এবং স্থানীয় সাধু-গণ মাকে বললেন, "মা, পুলিশরা বলছে, জল খুব বাড়ছে, এখান থেকে অন্য জায়গায় চলে যেতে হবে।" মা পুষ্পদিকে বললেন, "দিদিকে গিয়া বল্‌।" পুষ্পদি দাদাভাইকে এই বিপদের কথা জানাতে, দাদাভাই বললেন, "আমারে যে রক্ষা করবে, সে পাশের ঘরেই আছে।" দাদা-ভাই সম্পূর্ণ নিরুদ্বিগ্ন! এর পর মা বললেন স্বামী পরমানন্দজীকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে। স্বামীজীকে বন্যার কথা বলায় তিনি বললেন, "কে বলেছে? কাল ভাণ্ডারা। ওরা কেউ কাজ করতে চাইছে না।

সকলকে তরকারি কাটতে বলো।" তারপর স্বামিজী এসে মাকে বললেন, "মা, যদি জল বাড়ে, খাল কেটে দেবো। জল চলে যাবে।" এ কথা শুনে মা কিছুক্ষণ গম্ভীর থেকে হঠাৎ খুব হাসতে শুরু করলেন। মা বলছিলেন, "জব জল তীব্র বেগসে বড় রহা থা, এ্যায়সা সমাচার মিলা তব ইস শরীর কা এ্যায়সা খ্যায়াল হুয়া কি জল কো কহা যায়—অব ধীরে ধীরে উতর যাও।"

১৯৭৪ সনের ১৭ই মার্চ

মা অন্নপূর্ণা মন্দিরে কিছুক্ষণ বসে কবিরাজজীর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন।

মা বল্লেন, "বাবা, তুমি তো এ শরীরকে যোগাযোগ করিয়েছ। তোমাকে হরিদ্বারে নিয়ে যেতাম, কিন্তু তোমার শরীর তো ঠিক নেই। তুমিই তো প্রোগ্রাম বেঁধে দিয়েছ।"

তখন মা হরিদ্বারে কুম্ভমেলাতে যাচ্ছিলেন।

বাবা বল্লেন, "মা, তুমি নাকি আশ্রমে থাক না?"

মা উত্তর দিলেন, "এই শরীর তো সব সময় আশ্রমেই থাকে এবং খাওয়া দাওয়া করে।"

বাবা মায়ের হাত ধরে বল্লেন, "মা, তুমি মনে রেখো, ভুলবে না।"

মা বল্লেন, "এই শরীর সব সময় তোমার কাছেই আছে।"

কবিরাজজীর শিশুর মত সরল ভাব ছিল।

২৬শে মা সারারাত্রি জিনিষ গোছাচ্ছেন। প্রতিদিন রাত্রিতে আমি মার কাছে যাই।

আমাকে দেখে মা বল্লেন, "আমার জন্য রুটি ও খাক্‌রা করে দিবি। যদি পারিস্ তো জুস্ ঠাণ্ডা করে শিশিতে ভরে দিস্।"

আমি বল্লাম, "মা, একটু শুকনো তরকারি করে দেব?"

মা বল্লেন, "একটু আলু ভাজা করে দিস।" আবার বল্লেন, "তুই জেগে থাক্‌বি, শুবি না।"

আমি—"না মা, সারা রাত জেগে আমি বানিয়ে দেব।"

মা ভোরেই চলে যাবেন। মনে হয় ভোর ৪টায় মা রওনা হয়েছিলেন। আমি সারারাত জেগে খাবার বানালাম, কারণ খাক্‌রা বানাতে খুব সময় লাগে। আটা দিয়ে কাগজের মত পাতলা রুটি বানিয়ে তাওয়ার উপর কাপড় দিয়ে নেড়ে ভাজতে হয় খুব কম আগুনে। এটা গুজরাটী খাবার। মা-ই আমাদের শিখিয়েছেন। ভোরবেলা যখন মাকে খাবার গুছিয়ে দিলাম, মা খুব খুশী হলেন।

আমার মনে হল মায়ের আমার জন্য কত চিন্তা, আমার ঘুম হবে না। মায়ের এই স্নেহ আজও মনে হলে চক্ষু সজল হয়ে উঠে। আমার তো কিছু করার ক্ষমতা নেই। মা নিজে আমাকে আদেশ দিয়েছেন এবং আমাকে দিয়ে করিয়ে নিয়েছেন এই আমার সৌভাগ্য। মায়ের এই স্নেহ মনে হয় নিজের মায়ের চেয়েও গভীর।

১৯৭৪ সনের ১৫ই জুলাই

মা ভোর সাতটায় নৈমিষারণ্য থেকে এখানে এলেন। সঙ্গে ইন্দিরাজী, বিল্বজী ও পানুদা ছিলেন। মা এসেই কন্যাপীঠ ঘুরে ঘুরে দেখলেন। মেয়েদের জানলা সব বন্ধ দেখে মা বল্লেন, "জানলা বন্ধ রেখেছিস্ কেন? খোল্" কন্যাপীঠ ঘুরে মা গোপাল মন্দিরে গেলেন। আমি মার জন্য দুধ নিয়ে গিয়েছিলাম। মার মুখ ধোওয়ার গামলা আমার কাপড়ে লেগেছিল। মা দেখেই খুব বকলেন।

মা বল্লেন, "তুমি জান না? তুমি শেখ নাই যে গামলায় কাপড় লাগলে কাপড় এঁটো হয়? এখনই গিয়ে কাপড় ছাড়বে।"

আমার তো মন খুব খারাপ হল—মা এসেই আমাকে বকুনি দিলেন।

একটু পরেই, অর্থাৎ মুখ ধুয়ে, হেসে বল্লেন, "কেমন আছো গো? মোটাটা একটু কমেছে?"

মার কাছ থেকে এসে মার জন্য রান্না করলাম। ইন্দিরাজী খাওয়া-লেন। রান্না কি যে করেছি জানি না, কিন্তু মা একটু মুখে দিয়েছিলেন।

প্রতিদিন মা দুপুরে পাপড় খেতেন। আমি কন্যাপীঠ থেকে পাপড় সেঁকে নিয়ে গিয়ে দেখি মায়ের মুখ ধোয়া হয়ে গেছে। আমার মন খুব খারাপ হল—এত কষ্ট করে আনলাম আর মা খাবেন না! মায়ের মুখ ধোয়া হয়ে গেছে। মা আমার অবস্থা বুঝলেন এবং আমাকেই খাওয়াতে বল্লেন। আমি মাকে খাওয়ালাম। আমার খুব আনন্দ হল।

মা বল্লেন, "তোদের কত কষ্ট দেব? এ রকম ভাবে।"

অন্যায় করলেও মা কত স্নেহের সঙ্গে সংশোধন করতেন।

১৭ই জুলাই

গত রাত্রিতে মা খুব বকেছেন। এত বকুনি খাওয়া বোধহয় মায়ের কাছে প্রথম। সারারাত্রি মন খুবই খারাপ। মায়ের অসীম করুণা, মা তাই সকালে আবার মন ঠিক করে দিলেন।

মা কনখল চলে যাবেন। সকাল ৯টার মধ্যে মায়ের জন্য রান্না করলাম, মা ভোগে বসলেন। মায়ের জন্য অতি সাধারণ রান্না করে-ছিলাম। আজ মায়ের অন্য রূপ। মায়ের স্নেহ করুণা যেন আমাদের উপর অঝোরে ঝরে পরছে।

মা বল্লেন, "এখানকার মত রান্না কোথাও হয় না।"

বেলুদি বল্লেন, "ওরা কত পবিত্র ভাবে রান্না করে।"

মা উত্তর দিলেন, "ওরা কত পবিত্র ভাবে থাকে, গঙ্গার পারে ছোট-বেলা থেকে আছে, ওদের কত ভাগ্য। ওরা কত করে, কিন্তু সহানু-ভূতি পায় না, নিজেরাই গড়ে উঠল। কেউ না দেখুক, ভগবান্ তো আছে, ভগবান্ তো দেখছেন, তোমাদের তো চিন্তা নাই।"

বেলুদি বল্লেন, "মা ওদের তুমি তো আছ, ওদের কি চিন্তা ?"

আমি মাকে বললাম, "মা, তুমি তো আছ।"

খাওয়ার পর মা গোপালকে দর্শন করে সুখধামে গেলেন।

করুণাতে এক দণ্ডী স্বামী ছিলেন, তাঁকে মা ফল দিলেন। সকলের সঙ্গে দেখা করে "নারায়ণ, নারায়ণ" বলে মোটরে উঠলেন। আমরা প্রণাম করলাম। মা আমাদের মাথায় হাত দিয়ে আবার বললেন, "ভাল হয়ে প্রসন্নভাবে থাকবে। কুঁড়েমি করবে না, বড়দের কথা শুনবে, তর্ক করবে না, বুড় বুড় করবে না।"

মা কনখল রওনা হলেন।

১৯৭৬ সনের ৫ই মে

আজ সকালে মা হঠাৎ এসে পৌঁছালেন। গোপীবাবার ও ত্রিবেদী-জীর শরীর খারাপ। মা প্রথমে ত্রিবেদীজীর ঘরে গিয়ে তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। মাকে আসতে দেখে ত্রিবেদীজী বললেন, "মা, তুম শুনো, ভক্তো কী পুকার অবশ্য হী ভগবান্ শুনতে হ্যাঁয়। ম্যয়নে চারদিন তুমকো পুকারা ইস্লিয়ে ইৎনী গরমীমেভী তুম আয়ী হো।" ইস্কে লিয়ে মুঝকো প্রায়শ্চিত করনা পরেগা।"

মা চুপ করে ত্রিবেদীজীর আবেগমথিত কথা শুনছিলেন। শোনা হয়ে গেলে বললেন, "নহী, বাবা, ম্যয় অপনী ইচ্ছা সে আয়ী হু তুমকো দেখনে। তুম আচ্ছী তরহ সে খানা পীনা করো। ফাটা কাপড়া মৎ পহনো।" ত্রিবেদীজীর জামা একটু ছেঁড়া ছিল। মা এই সব কথা বলে হঠাৎ ত্রিবেদীজীর জামার ছিন্ন অংশটি আরো ছিঁড়ে দিলেন। উপস্থিত সকলে হেসে উঠলো। পরিবেশ হাল্কা হয়ে গেল।

ঘটনাটি আপাত দৃষ্টিতে ছোট্ট। কিন্তু ভেবে দেখলে হয়ত এরই মধ্যে গভীর তাৎপর্যের সন্ধান পাওয়া যাবে। ত্রিবেদীজী চারদিন ধরে মাকে ডাকছিলেন, রোগক্লিষ্ট চিন্তান্বিত অবস্থায়। মাকে হঠাৎ উপস্থিত হতে

দেখে তিনি ভাব বিহ্বল হয়ে কৃতজ্ঞতা জানাছিলেন। আবহাওয়া থম্‌থমে হয়ে উঠেছিল। আঙ্গুলের এক টানে মা সেই আবহাওয়াকে সরস হাস্যমুখর করে তুললেন।

দেহের উপমা বস্ত্র। জীর্ণ দেহ জীর্ণ বস্ত্রের ন্যায় পরিত্যাগ করার কথা গীতায় বলা হয়েছে। ছিন্নবস্ত্র হয়ত শারীরিক জীর্ণতার ভাব উদ্দীপন করে, তাই বোধ হয় মা কাউকে ছেড়া জামা কাপড় পরে থাকতে দেখলেই তা আরো বেশি ছিঁড়ে দিয়ে পরিধানের অযোগ্য করে দিতেন। কিংবা হয়ত তিনি এভাবে মানুষের জীর্ণ দেহের মোহবন্ধন শিথিল করে দিতেন। তাঁর রহস্যময়ী লীলা সম্পূর্ণ কে বুঝবে?

আরো একটা কথা। ত্রিবেদীজী বললেন, তাঁর ডাকেই মা এসেছেন। মা বললেন, তাঁর নিজের ইচ্ছায় এসেছেন। ভক্তের ডাক, আর মায়ের সাড়া—একি কাকতালীয়, না এতে কোন কার্য কারণ সম্বন্ধ আছে, আর থাকলেও সেটা কী ধরণের? ভক্তের আহ্বান আগে, না মায়ের ইচ্ছা বা "খেয়াল" আগে? এ বিষয়ে মাকে প্রশ্ন করলে মা বলতেন, ভগবানের কৃপা তো আছেই, খেয়াল তো আছেই, ইত্যাদি। অর্থাৎ কৃপা বা খেয়াল অহৈতুকী, তার কোন কারণ থাকতে পারে না। আবার মা কখনও কখনও কোন কোন বিষয়ে বলতেন, "তোরা আমায় খেয়াল করিয়ে দিস্।" আমরাও অনেককে বলতে শুনেছি, "মা, খেয়াল কর, মা খেয়াল রেখ"। ইত্যাদি। আমরাও যখন আমাদের দৃষ্টিতে মাকে "খেয়াল" করিয়ে দিতাম এবং সে খেয়াল সার্থক হত, মনে করতাম এ আমাদের কৃতিত্ব। আসলে কিন্তু মায়ের খেয়াল না হলে আমাদের "খেয়াল করিয়ে" দেবার খেয়াল হত না! তবুও মা আমাদের "খেয়াল করিয়ে" দেবার খেলা খেলাতেন, যাতে আমাদের বৃত্তি ও চেষ্টা মাতৃমুখী হয়, ভগবন্মুখী হয়। মা বলতেন, যতক্ষণ কর্তৃত্ব বোধ আছে, যতক্ষণ অন্যান্য উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আমরা চেষ্টা করি, ততক্ষণ ভগবৎ কৃপা লাভের জন্যও যথা সাধ্য চেষ্টা করতে হবে, যদিও কৃপা

চেষ্টা সাপেক্ষ নয়, কৃপা তো আছেই। যতক্ষণ অহং বোধ আছে, ততক্ষণ সাধনার প্রয়োজন। মায়ের অনুগ্রহ ছিল বলেই ত্রিবেদীজী চারদিন ধরে প্রার্থনা করে ছিলেন। তাই মায়ের এই স্বীকারোক্তি, "আমি নিজের ইচ্ছায়ই এসেছি।"

ত্রিবেদীজীকে দেখে মা গেলেন গোপীবাবাকে দেখতে। তিনিও বিশেষ অসুস্থ। মা তাঁর কাছে অনেকক্ষণ বসেছিলেন। গোপী বাবা অনেক কষ্টে বললেন, "আশীর্ব্বাদ কর।"

বুনিদির দিদিমার কাছে গিয়েও মা বললেন, "মা ভাল থাক। তাঁকে বল এ জীবনে যত ভোগ সব ভুগিয়ে যেন নিয়ে যান, আর যেন আসতে না হয়। ভগবান্‌কে ডাক।" মায়ের এ কথা থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে তাঁর আশ্রিত বর্গের মধ্যে কারুর যখনই জাগতিক দৃষ্টিতে কোন দুঃখভোগ হয়, তাও মায়েরই কৃপা, কারণ—করুণাময়ী মা ভয়ঙ্কর পুনর্জন্ম দুঃখের হাত থেকে পরিত্রাণ করার জন্য সকল পাপ তাপ ধুয়ে মুছে শেষ করে দেন।

অতুলদার শরীর ভালো নেই। মা গেলেন তাঁকেও দেখতে। বললেন, "কেমন আছ?" অতুলদা বললেন, "সমস্ত শরীরে বাত হয়েছে। স্নান করতে পারি না।"

মা বললেন, "মন্ত্র স্নান করো।"

বহির্মুখী মনকে অন্তর্মুখী করার উদ্দেশ্যে ও অন্তঃকরণকে শুদ্ধ করার জন্য স্নান-দান আদি বহিরঙ্গ নিয়ম-আচার পালন করা হয়। মাও শাস্ত্রমতানুসারে আমাদের বিভিন্ন ব্রতে ব্রতী করতেন। কিন্তু মন সম্পূর্ণ অন্তর্মুখ ও পবিত্র হলে অথবা শরীর অসমর্থ হলে মা সেই অনুসারে অন্তরঙ্গ সাধনার বিধান দিতেন। শরীর যতই রুগ্ন হোক না কেন, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যতই দুর্বল হোক্ না কেন, যতক্ষণ মন চেতন রয়েছে, যতক্ষণ শ্বাস-প্রশ্বাস বইছে, ততক্ষণ শ্বাসে-শ্বাসে নাম-মন্ত্র। রূপে ভগবৎ স্মরণ চলতে পারে। মা এই দিকটাতেই সব সময় বিশেষ জোর দিতেন।

১৯৭৬ সনের ৮ই জুন

মা শিবানন্দ আশ্রম থেকে প্রায় রাত্রি আটটায় কনখল আশ্রমে এলেন, এসেই মা বিশ্রাম করলেন। তারপর দর্শনার্থীদের দর্শন দিলেন। মা কিছুক্ষণ ছাদে শুয়ে আবার বারান্দায় এসে শুলেন, মা কিছুই খান নাই। আমি রান্না করে বসে আছি, রাত্রি হয়ে যাচ্ছে। খুব মন খারাপ হয়ে গেল, দুটো বেজে গেছে। তারপর মা ইসারা করলেন। তখন উদাসজী বল্লেন, "মা, জয়া এখনও খায় নাই।" মা এই কথা শোনা মাত্রই উঠে ঘরে এলেন। আমি সামান্যই রান্না করেছিলাম, মাও সামান্য মুখে দিলেন। মুখে দিয়েই মা বল্লেন, "তুমি খেতে যাও।"

মার কত স্নেহ, মা শুধু আমার জন্য একটু মুখে দিলেন। মার বাড়ী আমাদের ডেরা থেকে একটু দূরে তাই মায়ের আমার জন্য চিন্তা। আমি এত রাত্রে কি করে একলা ফিরব। তাই দাস্তুদাকে মা বল্লেন, "ওকে আশ্রমে পৌঁছে দাও।"

আমি বল্লাম, "মা, আমি নীচে থাকি, আমি চলে যাব।" মাকে না বলেই আমি শুতে চলে এলাম।

১৯৭৬ সনের ৯ই জুন

গোপীবাবার সম্বন্ধে মা রাত্রিতে পানুদাকে বল্লেন, "তুমি কাশী গিয়ে বাবাকে ভাল করে ডাক্তার দেখাবে।" পানুদা বল্লেন, "ডাক্তার বলেছে কোন রোগ নেই। কিন্তু কি যেন হয়েছে, কিছু খেতে পারছেন না। কারণ কিছু বোঝা যাচ্ছে না।"

১০ তারিখে অখণ্ড রামায়ণ পাঠ হচ্ছিল। মা কিছুক্ষণ পাঠে বসে পরমানন্দ স্বামীজীর সঙ্গে কথা বল্লেন। সেদিন মা গোপীবাবার শারীরিক অবস্থা খারাপ শুনে পানুদাকে পাঠালেন কাশীতে। প্রায় প্রতি দিনই রাত্রে আমরা মায়ের কাছে বসে চিঠি লিখতাম। আজও আমরা চিঠি লিখতে বসেছি।

মা বল্লেন, "শুধু বাবার মুখটা ভেসে উঠছে, যদি শরীর ভাল থাকত তা হলে এখনই রওনা হতাম, কিন্তু শরীর টলছে, চলতে পারছিনা।"

আবার কিছুক্ষণ পর বল্লেন, "দেখে তো এসেছি, কতক্ষণ বসেছিলাম, বাবা একবার মাত্র তাকিয়েছিলেন।"

মা বিরজানন্দজী এবং নির্মলানন্দজীকেও কাশী পাঠালেন। বিরজানন্দজীর হাতে মালা দিয়ে মা বল্লেন, "যদি শরীর থাকে, তাহলে মালা দিও। তা না হলে গঙ্গায় দিও।"

১১ তারিখে আবার দেবুদাকে কাশী পাঠালেন।

১২ তারিখে শুনলাম ৫-২০ মিনিটে বাবা ইহলোক ত্যাগ করেছেন। মা শুনেই স্বামীজীর কাছে গেলেন। মা সেদিন অজ্ঞাত-বাসে যাচ্ছিলেন। সমস্ত জিনিষ মার চলে গিয়েছিল। রওনা হওয়ার সময় মা খবর পেলেন।

রাস্তাতে মা বল্লেন, "একজন বিশেষ লোক চলে গেল।" পুনরায় মা বল্লেন, মা যখন গঙ্গালহরীতে, অর্থাৎ মে মাসে ২৫-২৬ তারিখ হবে, তখন বাবা মার কাছে এসেছিলেন। মার হাত নিজের বুকে রেখে বলেছেন, "আমাকে বিদায় দাও।" আরও কিছু আধ্যাত্মিক ব্যাপার হয়েছিল কিন্তু মা প্রকাশ করেন নাই।

মা ফোনে খবর দিতে বল্লেন, "পূর্ণাঙ্গীন ভাবে যেন সব কাজ হয়।"

মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজজীর উপর মায়ের বিশেষ খেয়াল ছিল। মা সর্বদা আমাদের কাছে খোঁজ নিতেন। আহারের ব্যবস্থা করে দিতেন।

৫ই জুন '৭৬ সনে মা যখন কবিরাজজীর কাছে এসেছিলেন, তখন তিনি অনেক কষ্টে মাকে বল্লেন, "আশীর্ব্বাদ করো।" মায়ের কাছে উনি শিশুর মত থাকতেন। ছোটবেলা থেকে দেখতাম কবিরাজজী যখনই মার কাছে আসতেন মা ব্যস্ত হয়ে উঠতেন। সন্ধ্যা পূজার ব্যবস্থা করতে বলতেন। কারণ কবিরাজজী নিয়মিত সন্ধ্যা পূজা করতেন।

মা রাত্রে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "বাবা কি খেয়েছে ?"

আমি—"কিছু খান নাই।"

মা—"কিছু না খাওয়া কি ভাল ?"

কবিরাজজীর মেয়ে সুধাদিকে বল্লেন, "শশীকে খবর দাও।" শশী হলেন কবিরাজজীর পৌত্র।

সুধাদি বল্লেন, "ওর ঘাম হয়েছে শরীর ভাল না।"

মা রাত্রে কবিরাজজীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে বল্লেন, "মহাত্মারা বসে আছে নয়ত এখানে এখন থাকতাম। বাবার শরীর ভাল দেখছি না।"

১৯৭৭ সনের ৩০শে জানুয়ারী

মা মোদী নগর থেকে কাশী এলেন। এসেই মা সকলের শারীরিক কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করলেন। মা অনেকের নূতন নূতন নাম দিলেন। উদাসজীর নাম হল সেবানন্দ ও অচলানন্দ। আমি জলখাবার খাওয়ালাম। মা খুব তাড়াতাড়ি করে খিচুড়ী রান্না করতে বল্লেন। কি যে রান্না করেছিলাম তাড়াতাড়ি করে জানি না, কিন্তু মা কৃপা করে একটু মুখে দিলেন। আমার মন খুব খারাপ কারণ দই জমে নাই। মা সাজ দই খেতেন।

মা বল্লেন, "দই জমলেই আমাকে দিস্।" আমি মার কথা শুনে শান্তি পেলাম। বিকালে মাকে দই খাওয়ালাম। মা খেতে খেতে বল্লেন, "তোমরা গীতার বিষয়ে বলতে শুরু করেছো ?"

আমি—"হ্যাঁ মা, আমরা এবার বলেছি।" রাত্রে মাকে মাখানা মধু দিয়ে একটু মুখে দিলাম। মা বল্লেন—"বেশী দিস্ না; বেরিয়ে যায়।" মার জন্য হরলিক্স তৈরী করেছি ?

মা বল্লেন, "তোরা এত ঘন করে হরলিক্স খাস ? মেয়েদের দিস্ না, ওদের পেট খারাব হবে।"

মেয়েদের উপর মায়ের সতর্ক দৃষ্টি ছিল। একবার উদাসজীর অসুখ হল। মা বল্লেন, "একদম আলু ভাজা দিবি না। জ্বর হয়েছে, দুধ রুটি খাবে। স্নান করতে না কর। কাশি কোথায়? কাশি তো কমে গেছে। হালুয়া খেতে দিবি না। বলে দে, মা যা বলবে তাই করবে।"

১৯৭৭ সনের ১৩ই নভেম্বর

মায়ের কাছে কোন জিনিষ চাইলে মা কখনও নিরাশ করতেন না। আমার বৌদির জন্য শাড়ী চেয়েছিলাম।

দুটো কাপড় দেখিয়ে মা বললেন, "কোনটা নেবে?"

আমি লালপাড় শাড়ী নিলাম।

মা—"এটা খুব ভাল কাপড়। অনেক দিন ধরে এই কাপড়টা রেখে-ছিলাম। কাউকে দিই নাই।" মায়ের কাছ থেকে শাঁখা সিঁদূরও নিলাম।

একবার দেরাদুনে আমার বাবা মার দর্শনে গিয়েছেন। একদিন আমি সারা দিন ব্যস্ত। বাবার সঙ্গে দেখা হয় নাই। হঠাৎ মা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কিরে তোর বাবা কোথায়? আজতো সারা দিন দেখলাম না।"

আমি—"মা আমিও আজ বাবাকে দেখি নাই।"

মা—"একটু খোঁজ কর।"

মায়ের কথা শুনে আমি বাবার খোঁজ করলাম। দেখলাম বাবার খুব শরীর খারাপ। আমার খুব চিন্তা হল বাবাকে কে দেখবে? আমার তো একেবারে সময় নাই। বাড়ীর লোকও কেউ নেই। কিন্তু আমার এই কথা মনে হল না যে যাঁর কাছে বাবা আছেন তিনিই সব ভার নেবেন। আমি গিয়ে মাকে বললাম, "মা বাবার খুব শরীর খারাপ।" মা শুনেই বাবাকে দেখতে এসে গেলেন।

মা—"বাবা, তুমি কেমন আছ?"

বাবা—"পেটে খুব যন্ত্রণা। শরীর ভাল লাগছে না।" বাবার কথা শুনে মা বাবার মাথায় ও শরীরে হাত বুলিয়ে দিলেন। মায়ের বরদ হস্তের স্পর্শ পেয়ে বাবা খুব আরাম বোধ করলেন।

মা আমাকে বললেন, "তুমি বার্লি ও মুসুম্বীর রস দাও।"

মায়ের কথামত আমি পথ্য দিলাম। বাবা শীঘ্রই সুস্থ হয়ে উঠলেন। এই ভাবে মা যে কত ভাবে কৃপা করেছেন তা বলে শেষ করা যায় না।

একবার কাশীতে আমার মাসী এসেছেন। মায়ের খুব শরীর খারাপ। আমি মাকে দর্শন করাতে পারি নাই। মাসী আমার উপর খুবই অসন্তুষ্ট। আমি কি করব ভেবে পাচ্ছি না।

মা হঠাৎ ঘর থেকে বের হলেন এবং চেয়ার করে গোপাল মন্দিরে গেলেন। আমি মাসীকে বললাম, "তুমি এখনি দেখা করো।"

ভীড়ের মধ্যে মা মাসীকে দেখে বললেন, "কেমন আছ? খাওয়া হয়েছে?" এই বলে চেয়ারে বসে মা মাসীর মাথায় হাত দিলেন। মাসী খুব খুসী হলেন। আমি ভাবলাম, ব্যাকুল হলেই মায়ের দর্শন পাওয়া যায়।

কুম্ভ মেলায় মার কাছে কনখলে গিয়েছি। তখনও নূতন বাড়ী তৈরী হয় নাই, মাত্র দুই তালা তৈরী হয়েছে। তিন তলায় কাঠের সিঁড়ি ছিল। আমাদের সেই সিঁড়ি দিয়ে উপরে যেতে হত। মাকে বলাতে আমাকে মা বললেন, "যেমন করে হোক্ বসে শুয়ে আমার ঘরে মাল রেখে কয়টা দিন কাটিয়ে দাও, ওখানে আর যেও না, ওরা তোমার মাল নিয়ে আসবে।" মায়ের কথামত আমি মায়ের কাছে রইলাম। এই ভাবে মা আমার উপর কত খেয়াল করেছেন তা বলে শেষ করা যায় না।

১৯৭৯ সনের ৯ই মে

বাঙ্গালোরে মাতৃ-জন্মোৎসব ছিল। মা ত্রিবেন্দ্রামের রাজার বাড়ীতে থাকতেন। জয়মহল প্যালেসে উৎসবের অনুষ্ঠান হত। সকল মাতৃভক্তদের জন্য বাসের ব্যবস্থা ছিল। একদিনের সামান্য ঘটনা আজ পর্যন্ত ভুলতে পারিনি। আশ্রমের এক ব্রহ্মচারী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য উৎসবের পর ফিরছিল। রাস্তায় তাকে কুকুরে কামড়ে দিয়েছিল। হাত, পা এবং সমস্ত শরীর দিয়ে রক্ত পড়ছিল। সে কাঁদতে কাঁদতে অস্থির হয়ে মার কাছে এসেছে। মা ঠিক সেই সময় উৎসব থেকে ঘরে ফিরেছেন। মা তাকে দেখেই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন এবং দুধ, হলুদ ও ঘি লাগাতে বল্লেন। আরও বল্লেন, "দুধ যদি না পাও, আমার দুধ নিয়ে এস।" মা আরও অন্যান্য ঔষধ দিয়ে ওকে সুস্থ করলেন এবং হাসপাতালে পাঠাবারও ব্যবস্থা করলেন। মা আমাদের দিকে তাকিয়ে বল্লেন, "আমি আসতে নিষেধ করেছিলাম, সেইজন্য ও আমার সাথে কথা বলে নাই।" আবার বললেন, "তোর এই চীৎকার আমি কনখল থেকেই শুনেছি, কিন্তু তুই কথা শুনলি না চলে এলি। আমি কি করব ?" মার কথা শুনে আমরা আশ্চর্য হয়ে গেলাম। মা জানতেন এবং নিষেধও করেছিলেন কিন্তু সে কথা শুনল না। তবুও মায়ের অফুরন্ত কৃপা, যেজন্য মা তখনই চিকিৎসার সমস্ত ব্যবস্থা করলেন। সেই কুকুরের মালিক এসে মার কাছে ক্ষমা চাইল। মা বললেন, "তুমারা দোষ নহী, উসকা জো ভাগ মে হ্যায়, ওহী হোগা।"

এই রকম অগণিত ঘটনা মার ভক্তদের নিকট ছড়িয়ে আছে।

১৯৮১ সনের ৩০শে মে

দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে আমরা সব মেয়েরা কনখলে মায়ের কাছে যাচ্ছি। খুব বড় বড় দুই ঝুড়ি বোঝাই করে পূজার সমস্ত জিনিষ পৃথক ভাবে নিয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু ষ্টেশনে সমস্ত মাল নামাতে গিয়ে

দেখি ছুটি ঝুড়ির একটিও নেই। ভয়ে মুখ শুখিয়ে গেল। কি করে সকলকে মুখ দেখাব ! সোজা মার কাছে গিয়ে বললাম, "মা পূজার বাসন খুঁজে পাচ্ছি না, আমার মন খুব খারাপ, কি করব তুমি বল।" এই বলে খুব কাঁদতে লাগলাম। মা বললেন, "তুমি কাঁদছ কেন ? তোমার শরীর খারাপ, তুমি দায়িত্ব নাও কেন ? কাঁদবে না। শোন, তুমি খেয়ে দেয়ে নিশ্চিন্ত হও আর পানুকে বল, "পানুদা, আপনার উপর ভার দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হলাম, আপনি ব্যবস্থা করুন।" পানুদা এই কথা শুনে তৎক্ষণাৎ দেরাছুনে লোক পাঠালেন। প্রথমে মা বলছিলেন, "আর কি পাওয়া যাবে ? দেখ, ভগবানের যা ইচ্ছা।" রাত্রে আবার বললেন, "কাশীতে থাকলে পেতে পারে।" আমি মায়ের কথা শুনে নিশ্চিন্ত হতে পারলাম না। মনে খুব দুঃখ। মা দুর্গার পূজা কি দিয়ে হবে ? আমি ভাবলাম, মা তো আমাকে খুব বকবেন এবং শাস্তিও দেবেন। কিন্তু মায়ের কি করুণা, মা শুধু বললেন, "তুই নিশ্চিন্ত থাক্"। এতো অসম্ভব কথা আমি দুই তিনদিন মায়ের কাছে যাই নাই, ঠিকমত খাওয়া দাওয়াও করি নাই। রাত্রে ঘুমাতেও পারি নাই। আমি সব সময় ট্রেনে যাতায়াত কালে শিবের একটি স্তব পাঠ করি। সেই স্তবে লেখা আছে, এ স্তব পাঠ করলে চোরে চুরি করতে পারে না, আগুনে পোড়ায় না, ইত্যাদি। আমার শিবের উপরও বিশ্বাস চলে গেল। কি করে বাসন হারাল ? এই চিন্তায় অস্থির। তিন দিন পর ছবিদি (গীতশ্রী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়) কনখলে দুর্গাপূজাতে এলেন। তিনি আমাদের বাসন নিয়ে পৌঁছালেন। আমি বাসন দেখেই দৌড়ে গিয়ে মাকে খবর দিলাম। মা শুনে বললেন, "ভগবানের কৃপা। আমি তো বলেছিলাম, তুই খেয়ে দেয়ে নিশ্চিন্ত থাক।" মায়ের কথায় তখন আমার মনে হল মা আমাকে নিশ্চিন্ত করে দিয়েছিলেন, কিন্তু আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে মাকে বোঝার শক্তি কোথায় ? এবং ভরসাই বা কোথায় ? শুনতে পেলাম কান্তিজী আমাদের ট্রেনে উঠিয়ে

আশ্রমে ফিরছিলেন। প্রথমে অন্যদিকে যাচ্ছিলেন, তারপর ভাবলেন না, আমি যে দিক্ দিয়ে এসেছি সেই দিক্ দিয়েই যাব। যেতে যেতে দেখতে পেলেন একটি দোকানের নীচে আমাদের বাসন পড়ে আছে। দেখেই কাউকে কোন কথা না বলে সোজা আমাদের আশ্রমে নিয়ে এলেন। তারপর তাড়াতাড়ি করে ছবিদির সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন।

ঘটনা অতীব ক্ষুদ্র, কিন্তু আমার জীবনে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে।

সান্ত্বনা ও ঊর্ধ্বগতিবিধান

কতদিন যে কতভাবে মায়ের অন্তর্দৃষ্টি ও সর্বদুঃখতাপহরা করুণার পরিচয় পেয়েছি, তা বলে শেষ করা যায় না। উমা এবং অরুণা, দুই বোন, কন্যাপীঠের দুটি নেপালী মেয়ে। খবর এসেছে তাদের বাবা মারা গেছেন। সে কথা তাদের বলা হয়নি, কান্নাকাটি করবে বলে। কিন্তু মায়ের নির্দেশ, তাদের অবিলম্বে বাড়ী পাঠিয়ে দিতে হবে। বিদায়কালে মা মিষ্ট কথায় তাদের অনেক উপদেশ দিলেন। মাকে প্রণাম করে ওরা চলে গেল। রাত্রে মা আমাকে দিয়ে ওদের চিঠি লেখালেন, "তোমরা সম্পূর্ণ রাস্তা মনোকষ্টে কাটাবে, অস্বাস্থ্য হবে, এই সব নানা কারণে বাবার বিষয়ে তোমাদের কিছু বলা হয় নাই। পিতা-মাতার কষ্ট, সন্তানের বড় ব্যথা। ভগবানের বিধান মেনে নিতেই হবে। তোমাদের মাকে বলবে রোজ যেন একটু ভাগবত পড়ে।" এটি ১৯৭৫ সালের ২৬শে জুনের ঘটনা।

১৯৭৬ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী

রাত্রে খবর পেলাম চ্যারিটেবল সোসাইটির সেক্রেটারী শ্রীজগদীশ পাণ্ডেয় খুব অসুস্থ। তাঁর ছেলে মার কাছে প্রার্থনা জানাল, সুস্থ হবার কামনা করল। কিন্তু যা হবার তা তো হবেই। রাত্রি পৌনে

দশটায় তিনি মারা গেলেন। চিত্রাদি মাকে তাঁর বিষয় শোনাল, ডাঃ চ্যাটার্জীও মাকে সব খবর দিলেন।

মা বল্লেন, "অনেকদিন আগেই বুকে ব্যথা ছিল, কিন্তু ও বলে নাই—আমাকে বলেছিল। আমি চিকিৎসা করতে বলেছিলাম। হঠাৎ চলে গেল, তিনবার আক্রমণ হল। তৃতীয় বারের বার আর রাখা যায় না।" আমাদের কীর্ত্তন করতে বল্লেন।

তাঁর মেয়ে অরুণা কাঁদতে কাঁদতে মার কাছে এলেন!

মা বল্লেন, "বিশ্বনাথ নিয়ে গেছে। আমি দেওঘর থেকে মালা দিয়ে পাঠিয়েছিলাম মালাটা রেখে দিতে বলেছিলাম। সেই মালা ভাল থাকলে একটা দিয়ে দাও।"

অরুণাজী বলল, "মা তোমার শরীর ভাল রেখ।

মা বল্লেন, "তুমি তোমার মাকে সামলাও, খুব জপ কর।"

গৌরীনাথ শাস্ত্রী মহাশয় কলকাতা থেকে এসেছেন। তিনি বল্লেন, "কাশীতে মড়া বাসী হয় না। তাই কাল সকালে সব কাজ হবে। গীতাপাঠ করো।"

মা অরুণাজীর সঙ্গে চিত্রাদিকে পাঠালেন এবং গীতাপাঠ করতে বল্লেন।

পাণ্ডেয়জীর বিষয় মা ডাঃ মাথুরকে বল্লেন, "তোমার ভাইও আমাকে ষ্টেশনে পৌঁছে অসুস্থ হয়েছিল। ও-ও আমাকে পৌঁছে এসে বিছানায় পড়ল। ডাক্তার আর ভাল করতে পারল না।" ডাঃ মাথুরের ছোট ভাইও মারা গিয়েছিলেন। উনিও খুব দুঃখিত, তাই মা তাঁকেও সান্ত্বনা দিলেন।

আমাদের অধ্যাপিকা ভক্তিসুধাদিকে তার দাদার মৃত্যু সংবাদ শুনে মা বল্লেন, "যে যার নিজের স্থান করে চলে যায়, কিন্তু তার সঙ্গী-সাথীদের কষ্ট হয়, সবসময় সৎচিন্তায় মন রাখা।" ভক্তি-

সুধাদির দাদার বিষয়ে ভাস্করদাকে মা বল্লেন, "কত জ্ঞানী গুণী ছিলেন।"

১৯৭৭ সনের ৩১শে মার্চ্চ

বাসন্তী পূজার দশমী। রাত্রে খবর পেলাম যোগীভাই মারা গেছেন। মা শুনেই মেয়েদের কীর্তন করতে বল্‌লেন। ৯টা থেকে ১১টা পর্যন্ত কীর্তন হল। মা যোগীভাই এর বিষয়ে অনেক কথা বল্‌লেন। পরদিন আবার যোগীভাইএর বিষয়ে বললেন, "দিদি, এবার আসার সময় যোগীভাই বল্‌ল, 'মা শরীর ভাল রাখ।' চোখে জল দেখলাম। আমি পিঠে হাত বুলিয়ে দিলাম। বল্‌ল—"মা, ষ্টেশনে আর যেতে পারব না।" আমিও নিষেধ কর্‌লাম। বোধহয় বুঝতে পারছিল আর শরীর রাখা ঠিক হবে না।" আবার বল্‌লেন, 'সকলকেই যেতে হবে আগে আর নিছে।''

অতিথি সেবা

আমাদের আশ্রমে কেউ এলে তাঁর সেবাযত্নের জন্য যা কিছু প্রয়োজন, মা আমাদের একটি একটি করে বুঝিয়ে দিতেন। মা যার জন্য যা রান্না করতে বলতেন, দেখা যেত সেই জিনিষটিই তাঁর বিশেষ প্রিয়। কে কোন্ প্রদেশ থেকে আসছেন, তাঁর স্বাস্থ্য ও জীবনচর্য্যা কেমন, এসব বিচার করে তো আহারাদির ব্যবস্থা করতেনই, এছাড়াও ব্যক্তিগত রুচির ব্যাপারে মায়ের অন্তর্যামিত্ব প্রকাশ পেত। কাকে বেশি করে পাপড় ভাজা দিতে হবে, কে পকৌড়ি ভালবাসে, কার জন্য লুচি, আলুর দম করতে হবে, এসব মা আমাদের আগে থেকে বলে দিতেন।

মা বারে বারে বলেছেন, সেবায় চিত্ত শুদ্ধি হয়, যদি ধৈর্যের সহিত, প্রসন্ন চিত্তে, নিষ্কামভাবে সর্বাধারে ভগবৎ প্রীতির জন্য সেই সেবা করা হয়। এ প্রসঙ্গে আমার দিনলিপি থেকে দু'একটি ঘটনা তুলে দিচ্ছি।

১৯৭১ সালের ৩০শে মার্চ

আজ পঞ্চমী তিথি। আগামীকাল ষষ্ঠী তিথিতে শ্রীশ্রীবাসন্তী দুর্গা-দেবীর বোধন। আজ কথায়-কথায় আমি মাকে বলছিলাম, "মা, কাল থেকে পূজার কাজ করতে হবে।" আমার গলার স্বরে হয়ত ঈষৎ চিন্তা প্রকাশ হয়েছিল। মা বললেন, "তোমাদের আশ্রম, তোমাদেরই পূজা। এই শরীর তো উড়োপাখী। ঢোকে, আর বেরিয়ে যায়।" পূজার কাজ এ জন্য দেওয়া হয়, যাতে তোমাদের চিত্ত শুদ্ধ হয়। তোমাদের এই কাজ থেকে ছুটি দেওয়া যেত, কিন্তু এ কাজে তোমাদেরই মঙ্গল হবে। অতিথি-সেবার কাজও এজন্য দেওয়া। যদি বোঝা মনে কর, তা'হলে দুর্গতি হবে, দুর্ভোগ হবে, ভগবানের কাছ থেকে দূরে সরে যাবে। যদি সেবা মনে কর, তাহলে ফল ভাল হবে।"

১৯৮০ সালের ৭ই মার্চ

প্রসিদ্ধ পণ্ডিত গৌরীনাথ শাস্ত্রীজী মাতৃদর্শনে এসেছেন। মা আমাকে ডেকে বুঝিয়ে দিলেন তাঁর খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদির ব্যবস্থা কেমন করে করতে হবে। বললেন, "শোন্, সুন্দর করে আলুর দম, লুচি আর পকৌড়ি বাবার জন্য বানিয়ে দে। আর এক গ্লাস দুধ দিস্। এক গ্লাস দিয়ে আবার জিজ্ঞাসা করিস্, 'আর লাগবে?' যা যা তাড়া-তাড়ি করে দে।"

রাত্রে আবার ডাকলেন। বললেন, "খেয়েছে?"

আমি,—"হ্যাঁ"।

মা,—"শোন্, এবার থেকে বলবি যে 'আপনি কাশীতে এলে আশ্রমেই থাকবেন। আমি ব্যবস্থা করে দেব। কোন সঙ্কোচ করবেন না।' বুঝলি? বলবি।"

আমি—"আচ্ছা মা, বলব।"

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের কুলপতির আসার কথা। মা বললেন, "ওদেরকে ভাল করে খাইয়ে দিও, তুমি ষ্টিলের থালা বাটী গ্লাস বার কর।"

আমি—"থালা বাটী আছে, গ্লাস নেই।"

মা—"উদাসের কাছে গ্লাস আছে, নিয়ে নে।"

কুলপতিজীর দীক্ষা হয়েছিল, মা তাঁদের খাওয়াতে বললেন। কি রান্না হবে সে বিষয়েও বললেন। মা তাঁদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। ভোজনের পর তাঁরা মায়ের কাছে এল।

মা—"থোড়ী দের বৈঠ জাও।"

শ্রীমালীজীর স্ত্রী বললেন—বৈঠনে কো তো আচ্ছা লগতা হ্যায়। পরন্তু আপকা ভোজন নহী হুয়া।

মা—"তুম লোগোঁ কো থোড়া জলপান মিলা থা? ভোজন অচ্ছি-তরহ সে হুয়া? তুম লোগ মিলকর জাওগে ইসলিয়ে ভোজন মেঁ নহী বৈঠী।" মা তাদের কাপড় দিলেন। মা তারপর ভোগে বসলেন।

১৯৭৭ সনের ৩০শে মার্চ

মা আমাকে ডেকে বললেন, "আমার ষ্টীলের বাসন আছে, সেই থেকে বাসন নিয়ে আয়।" শ্রীমতী শুভলক্ষ্মী আসবেন, তাঁদের খাওয়ার ব্যবস্থা মা করতে বললেন।

আমি—"মা, কোথায় বাসন আছে আমি জানি না তো?"

মা—"জানি না বললে হবে না, জগে করে দুধ নিয়ে ঢেলে দেবে। একটা পিতলের বাল্‌তীতে জল ভরে রাখবে। হাত ধোবার জল রাখবে। তোয়ালে রাখবে।" ওদের সমস্ত জিনিষ মা সাজিয়ে রাখতে বললেন। পরে আবার আমাকে ডেকে বললেন, "একটু ফল মিষ্টিও দিস্, পাপড়ও দিস্।" শ্রীমতী শুভলক্ষ্মী গোপাল মন্দিরে অনেক গান করলেন। গোপাল মন্দির হয়ে অন্নপূর্ণা মন্দিরে প্রণাম করতে

এলেন। সব মন্দির দর্শন করে কন্যাপীঠের বারান্দায় জলখাবার খেলেন। জলখাবার খেয়ে প্রসন্ন হলেন। খাবার পর মায়ের দর্শন করে চলে গেলেন।

কেউ এলে মা খোঁজ নিতেন। কি বলল, কি খেল অতিথিরা—সমস্ত খবর মা জিজ্ঞাসা করতেন।

আমি --"মা, ওরা পাপড় আর কফি খেয়েছে।"

মা—"আমি তো বলেছি পাপড় দিতে, দেখলি তো ওরা কি সুন্দর খেল" ইত্যাদি।

মা বেশ প্রসন্ন হলেন, মার কথামত পাপড় দিয়েছি। আমাদের মনেও আসে নাই সকালে জলখাবারে পাপড় দেবার কথা।

১৯৭৮ সনের মে মাস, কনখল

প্রায় রাত্রি ১২টা হবে। আমরা মার কাছে বসে আছি। আমাদের ঘুম পেয়ে গেছে। ইতিমধ্যে উপাধ্যায়জী এলেন। তাঁর হাত ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। তিনি মাকে বললেন, "মা, উত্তর কাশী যাচ্ছিলাম। একেবারে পাহাড়ী রাস্তায় খাদের মধ্যে গাড়ী গিয়ে উল্টে পড়েছে; কিন্তু কারও কিছু হয় নাই, শুধু আমার হাত ভেঙ্গে গেছে।"

মা বললেন, "দেখ, তুমি যাওয়ার সময় এই শরীরের সঙ্গে দেখা করতে পার নাই? এ শরীরের দরকার ছিল। এ শরীর এ রকমটাই দেখছিল।

উপাধ্যায়জীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে মা ওদের খাওয়ার জন্য হালুয়া করতে বললেন। সকলে চলে গেল। ঐ রাত্রে আমাদের কিছুই করতে ইচ্ছা করছিল না, কিন্তু মায়ের আদেশে আমাদের করতেই হবে। অতিথি সেবার জন্য রাত্রি দিন ছিল না এবং আলস্যও ছিল না।

একবার মা অজ্ঞাতবাসে আছেন। মায়ের খবর বহুদিন ধরে পাচ্ছি না। মায়ের খবরের জন্য অস্থির হয়ে উঠলাম। কি করে খবর পাব

চিন্তা করছি। সকলকে জিজ্ঞাসা করছি। নানা জায়গার নাম সকলে বলছে, কিন্তু মনে শান্তি নেই। এমন সময় কন্যাপীঠের মেয়ে গীতা নৈমিষারণ্য থেকে এল। ওকে দেখে মনে শান্তি পেলাম। মায়ের আদেশ অনুসারে ও কাউকে মায়ের খবর দিল না। শুধু আমাকে কানে কানে বলল, "জয়াদি, মা তোমাকে শুধু জানাতে বলেছেন যে মা নৈমিষারণ্যে আছেন।" আমি ওর কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে গেলাম, মা আমার মনের অবস্থা জেনেই বোধহয় গীতাকে পাঠিয়েছেন।

এই ক্ষুদ্র ঘটনাতে মায়ের কথা মনে হল, "ব্যাকুলতাই ভগবৎ প্রাপ্তির পথ।"

তিন

উৎসব

তিন

উৎসব

উপনিষদ্ বলেছেন, "তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত"। সেই এক পরম তত্ত্ব, পরব্রহ্ম থেকে সমগ্র বিশ্বের সব কিছু উদ্ভূত হয়, তাঁর দ্বারাই ধৃত থাকে এবং পরিণামে তাঁতেই লয় প্রাপ্ত হয়। এবমপ্রকার ধ্যান-ধারণার দ্বারা চিত্তকে শান্ত, সমাহিত করে সেই পরমতত্ত্বের উপাসনা করতে উপদেশ দেওয়া হ'য়েছে। উপনিষদের উপাসনা ও তপঃ, যা গুহ্যাতিত, নিগূঢ় তত্ত্ব, গুরুমুখী বিদ্যা, বিভিন্ন পর্যায়ে তা-ই বহুরূপে প্রকাশ পেয়েছে শ্রীশ্রীমায়ের সাধন লীলায় ও তাঁর দিব্য পরিমণ্ডলে। আমরা কিছু-কিছু শুনেছি তাঁরই মুখে, কিছু-কিছু দেখেছি তাঁরই সঙ্গে থেকে।

মায়ের খেয়ালে ভক্তজনের কল্যাণার্থে সমবেত রূপে উপাসনার ক্রিয়া শুরু হয়েছিল খুবই সহজভাবে। দিনলিপি থেকে নেওয়া একদিনের কথা। সেদিন শনিবার অমাবস্যা ছিল। পূজা হচ্ছিল। মা খুব সুন্দর সুন্দর কথা বলছিলেন। বলছিলেন আগেকার কালে কীভাবে কীর্তন, উৎসব, ভাণ্ডারা ইত্যাদি হত সেই গল্প। মা বলছিলেন, "প্রসাদের এত আদর ছিল। প্রফুল্ল ঘোষ মাটিতে বসতে পারত না, সেও মাটিতে পা মেলে বসে খেত। আমাকে এসে বলত, 'মা, খেয়ে এলাম।' তখনকার কথাই আলাদা ছিল। তখন খাপ্‌রার ঘর ছিল, জঙ্গল ছিল, টিনের ঘরও ছিল। তখন তোমাদের ভাণ্ডারের প্রশ্ন নাই। স্তূপাকার চাল পড়ে আছে। দোকানদারেরা চাল, ঘি, তেল নিজেরা দিত। ঘর ভর্তি ছিল। খুল্‌তাছে, নিতাছে, খাইতাছে—দেখবার প্রশ্ন নাই। বিরাট বড় চুলা, বড় বড় বাসন। বাসনওয়ালার কাছ থেকে বাসন আসত, তাতে খিচুড়ি ঢালা হত। বাল্‌তি দিয়ে উঠিয়ে

মাটির খুরি দিয়ে দিত, কোথায় হাতা ? ওই একটা আনন্দ। বৃষ্টি হচ্ছে, রোদে মাথা পুড়ছে, কেউ মাথায় জল দিচ্ছে, কেউ মাথায় কাপড় দিচ্ছে, আর খিচুড়ি খাচ্ছে। চেনা-অচেনা নেই ; মুখ দেখে খাওয়ানো ছিল না।"

গোপালদা—"মা, সকলে একসঙ্গে বস্‌ত ?"

মা—"ওই যে—পাব্‌লিক ! ভোগের প্রসাদ, ছোঁয়াছুঁয়ি নেই। ব্রাহ্মণরা রান্না করত, ব্রাহ্মণরা পরিবেশন করত। শুধু যারা বিধবা, তারা আলাদা রান্না করত। মটরী রান্না করত। বড় বাসনে ডাল বসাল। সম্বরা দিয়ে আঁচ কমিয়ে দিল। ভাত বসিয়ে দিল। রান্নার বেশ ধরণ ছিল। ঘরের আশে পাশে খাচ্ছে, মাঠে খাচ্ছে। পরামর্শ করা নেই, কোথায় রাখবে, কারা দেবে। সবই তাদের হাতে। যারা দেবে বলেছে, তাদের থেকে দই আন্‌ল। অমৃতি আন্‌ল। ঠাকুরের নাম চলত, খাওয়া চলত, হিসাব নিকাশ ছিল না। হয়ত পাতা নিয়ে বসে আছে। কিছু মনে করছে না। আবার নিজেরা আন্‌ছে, নিজেরাই সব করছে।"

এ-হল ভারতীয় উপাসনা ও দিব্যপরিমণ্ডল রচনার আধুনিকতম রূপ। এযেন শ্রীজগন্নাথ পূজাধাম—শ্রীক্ষেত্র, মহামানবতার মিলন-ক্ষেত্র। মহাপ্রসাদ জঠরাগ্নির পরিতৃপ্তি। স্বর্গ ও মর্ত্যের গঙ্গা-সাগর সঙ্গম। এইখানে শুরু করে উপাসনার স্রোতোধারায় উজান বইতে বইতে ক্রমশঃ গঙ্গোত্রী-গোমুখ অভিমুখে যাত্রা হল। প্রথমতঃ কলির তারকমন্ত্র নামসংকীর্তন দিয়ে শুরু। শুধু মনে, মুখে নাম এবং ভাণ্ডারহীন উন্মুক্ত ভাণ্ডারার মহাপ্রসাদ বিতরণ। অতঃপর মায়ের খেয়ালের ধারা বইতে লাগল বিভিন্ন পৌরাণিক, তান্ত্রিক ও বৈদিক মঙ্গলানুষ্ঠানের তট প্লাবিত করে। পুরাণবর্ণিত দেবদেবীপূজা, তন্ত্রমতে শক্তি আরাধনা ও মন্ত্রচৈতন্য সাধন ও বৈদিক হোম, অগ্নিহোত্র আপন-আপন মহিমায় আদি ও অকৃত্রিমরূপে জেগে উঠল। বঙ্গদেশ থেকে

হিমালয়ের উপত্যকা। ঢাকার নাম সংকীর্তন থেকে কনখলের অতিরুদ্র মহাযজ্ঞ। আধ্যাত্মিক জাগরণের এই জয়যাত্রার আদি ও অন্তে দেখতে পাই মেয়েদের ভূমিকা। ঢাকায় থাকতে মা মেয়েদের অখণ্ড নামযজ্ঞে ব্রতী করেছিলেন। আবার দেখতে পাই, অতিরুদ্রযজ্ঞের প্রস্তাবনা, ব্যবস্থাপনা, সব কিছুই মায়ের সুযোগ্যা মেয়েরাই করেছেন। আমরা কন্যাপীঠের মেয়েরা মায়ের কৃপায় বিশেষ সুযোগ পেয়েছি ৺ কাশীধামে বাসন্তীপূজা করার। ঢাকার রমনা আশ্রম থেকে আনীত পবিত্র হোমশিখা এখানে সংরক্ষিত রয়েছে সাবিত্রী যজ্ঞকুণ্ডে। এছাড়া আমাদের নিত্য এবং নৈমিত্তিক পূজা, ব্রত, উৎসবে আমরা মাকে কতভাবে, কত-রূপে পেয়েছি, সে সব কথা ভুলবার নয়।

১৯৫৩ সনের ২০শে নভেম্বর

একটু একটু মনে পড়ে যখন আমি মায়ের কাছে আসি তখন খুব ছোট। কোহিনূর দাদার বাড়ীর সম্মুখে সংযম-সপ্তাহের প্যাণ্ডেল বানান হয়েছিল। অনেক লোক দেখেছিলাম। কলিকাতার মত মহানগরীর বুকে শান্তভাবে সংযম সপ্তাহ হয়েছিল। কলিকাতায় প্রথম সংযম সপ্তাহ ছিল। সংযম-মহাব্রতের তৃতীয় অনুষ্ঠান।

১৯৫৪ সন, ঝুলন উৎসব

আমাদের আশ্রমে গোপাল এলেন। আমরা সব গোপালকে নিয়ে কীর্তন করলাম। মা ঝুলন তিথিতে কাশী এলেন। গোপাল ঝুলন একাদশীতে এলেন। গোপাল দেখতে প্রমাণ আকারের নবজাত শিশুর মত। ওজনে প্রায় ১৮ সের। মা বললেন, "দেখ, দেখ, কি সুন্দর!" কবিরাজ মহাশয়ও সেই সময় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, "এ ত একেবারে জাগ্রত বিগ্রহ।" মা গোপালের বিষয়ে অনেক কথা বললেন। আমরা ছোট ছিলাম কিছুই প্রায় শুনতে পেলাম না।

ঝুলন ও জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে কাশীতে মায়ের আগমন হল। মেয়েরা একাদশী থেকে ঝুলন উৎসব আরম্ভ করল। আমাদের হলে খুব বড় একটা দোল্‌না টাঙ্গান হয়েছিল। মা তাতে শুতে পারেন, এত বড় দোলনা ছিল। সব মেয়েরা ধীরে ধীরে মাকে দোলাত। একদিন ভগীরথের গঙ্গা অবতরণ, রামানুজ লীলা, অন্যদিন নিমাই চরিত, আর একদিন মহিষাসুর বধ ইত্যাদি অভিনয় হয়েছিল। আমি দুর্গা সেজেছিলাম। বাজনার তালে তালে নেচে নেচে অভিনয় করেছিলাম। সমস্ত দেবতার তেজ থেকে দেবীমূর্ত্তি আবির্ভাব হল। মহিষাসুর বধের পর স্তবপাঠ হল। মা দেখে খুব আনন্দ প্রকাশ করলেন। তারা বলে একটি মেয়ে মহিষাসুর হয়েছিল। সে 'বধ' হয়ে পড়ে আছে। মা অভিনয়ের মধ্যেই তাকে উঠে আসতে বললেন। দর্শকদের সামনেই 'মহিষাসুর' উঠে এসে মাকে প্রণাম করল। এখন মনে হয়, মা বোঝাতে চেয়েছিলেন যে মৃত্যুটাই সব কিছু নয়। মৃত্যুর পর মুক্তি পেয়ে মায়ের চরণে আসাটাই আসল কথা। অন্যদিন আমি খোঁড়া সেজেছিলাম। লীলার পর মাকে প্রণাম করাতে মা বললেন, "তোমার খোঁড়া পা ভাল হয়ে গেল ?" চারদিন লীলার পর পূর্ণিমার দিন মা আমাদের হাতে রাখী বাঁধতেন। এই দিনটার জন্য আমরা উৎসুক হয়ে অপেক্ষা করতাম। মা নিজেও অনেকক্ষণ কীর্ত্তন করতেন। এত লোক আমাদের হলে এবং বারান্দায় হত যে আমরা যেতেও পারতাম না মার কাছে। মা নিজেও নূতন লীলা শিখিয়ে দিতেন। মা মাঝে মাঝে আমাদের সঙ্গে লীলা করতেন। মনে হত আমরা বৃন্দাবনে আছি।

১৯৫৬ সনের মে মাস

মায়ের ষষ্টিতম জন্মোৎসব কাশীতে হল। বহু ভক্ত-সমাগম হয়েছিল। অবধূতজী ও হরিবাবাজীর আগ্রহে মা অষ্টধাতু নির্মিত বৃহৎ

সিংহাসনে বসেছিলেন। সকালে রাসলীলা হত। একদিন সারারাত 'নদের নিমাই' অভিনয় হয়েছিল। আমাদের খুব আনন্দ হয়েছিল। কন্যাপীঠের সামনের উঠানে তুলাদান হয়েছিল। মাকে ধাতু, চাল, গম, কাপড় ইত্যাদি দিয়ে ওজন করা হয়েছিল। একটু একটু মনে পড়ে, এত কাপড়ের মধ্যে মা বসেছিলেন যেন কাপড়ের পাহাড়, মাকে আর খুঁজে পাই না। ভীড়ের মধ্যে ধাক্কা খেতে খেতে দূরে সরে যাই। এই সময়ে এপার থেকে ওপার মা গঙ্গাকে মালা পরান হয়েছিল। গঙ্গাতে এক মন দুধ ঢেলে পূজাও হয়েছিল।

১৯৫৬ সনের দুর্গাপূজা

মাকে মণ্ডীর রাণী দুর্গারূপে পূজা করেছিলেন। মনে আছে, কন্যাপীঠের একটি মেয়েকে স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিতা করে কুমারী পূজা করা হয়েছিল। আমরা খুব আনন্দ করেছিলাম।

মায়ের সঙ্গে নৈমিষারণ্যে গিয়েছিলাম। প্রয়াগ নারায়ণ ভাই গোমতী নদীর ধারে মার জন্য কুটিয়া নির্মাণ করিয়েছিলেন। সাধুদের জন্যও কুটিয়া ছিল। তখন এত সাধু দেখতাম মার কাছে, আমার খুবই আনন্দ হত।

১৯৬১ সনের অক্টোবর

মার সঙ্গে কানপুরে গিয়েছিলাম। সেখানে শ্রীজয়পুরিয়াজী দুর্গাপূজা করেছিলেন। মা তো গৃহস্থ বাড়ীতে থাকতেন না, তাই মায়ের জন্য খুব সুন্দর ফুসের কুটিয়া বানান হয়েছিল। আমাদের খুব ভাল লাগত। আমরা সময় পেলেই মায়ের কাছে গিয়ে বসতাম। খুব বড় প্যাণ্ডেল ছিল, প্যাণ্ডেলের মধ্যে মায়ের আসন পাতা ছিল, আর অন্যদিকে মহাত্মাদের আসন ছিল। আমাদের পূজাতে খুব আনন্দ হয়েছিল।

এই বৎসরেই নৈমিষারণ্যে সংযম সপ্তাহ হয়েছিল পরমানন্দ স্বামীজীর

অক্লান্ত পরিশ্রমে। সেখানে ছোটখাট শহর হয়ে উঠেছিল। ভারতের নানা স্থান থেকে বহু ভক্ত সমাগম হয়েছিল। অনেক মহাত্মাদেরও আগমন হয়েছিল। আমরা সাধুদের রান্না করতাম। মা রোজ রাত্রে কি কি রান্না হবে বলে দিতেন। আমাদের মা বলতেন, "তোদের সংযমের কি দরকার? তোরা তো সংযমেই আছিস।" মা আমাদের সেবার কাজ বেশী দিয়েছিলেন। তখনও নৈমিষারণ্যে আশ্রম হয় নাই। আমরা সকলে তাঁবুতে থাকতাম।

মার সঙ্গে কিছুদিন পুনাতে ছিলাম। সেই সময় হরিবাবা সেখানে ছিলেন। প্রতিদিন রাসলীলা হত, সন্ধ্যায় সৎসঙ্গ হত। শ্রীদিলীপ রায় আসতেন, মাকে গান শোনাতেন। গানের ঝঙ্কারে সভা মুগ্ধ হয়ে যেত। আমরা তাড়াতাড়ি কাজ সেরে গান শুনতাম। কখন কখন মাও গান করতেন। মায়ের আশ্রম তখন খুব ছোট ছিল।

কিছুদিন নন্দাভাই-এর বাড়ীতে ছিলাম। সেখানে হরিবাবাও ছিলেন। প্রতিদিন রাসলীলা হত, রাত্রিতে মা প্যাণ্ডেলে শুতেন। আমরা মায়ের চারিদিকে শুতাম। প্রায় প্রতিদিনই মা আমাদের গল্প শোনাতেন। আমাদের খুব ভাল লাগত। একদিন মা বলছিলেন, মা ছোটবেলায় সাঁতারে প্রথম হতেন। সকলে মাকে খুব ভালবাসত। কেউ কেউ মায়ের চুল বেঁধে দিত। গ্রামের প্রায় সব লোকই মার কাছে আসত। মাকে না দেখলে তাদের ভাল লাগত না। মা আরো অনেক কথা বলেছিলেন কিন্তু সব মনে নেই। মায়ের এমন আকর্ষণী শক্তি, যে মাকে কেউ ছাড়তে পারত না।

তখনকার একটি ঘটনা। একদিন রাত্রে মা আমাদের প্যাণ্ডেল থেকে উঠিয়ে ঘরে নিয়ে এলেন। প্রায় রাত্রি ২টা বাজে, আমরা সকলে ঘুমন্ত চোখে উঠে এলাম। তখন পুষ্পদি মায়ের সেবায় ছিলেন। পুষ্পদি শুনতে পেলেন মা গুন্‌গুন্ করে "হরি নাম লিখে দিও অঙ্গে" এই গানটা গাইছেন।

কিছুক্ষণ পর মা পুষ্পদিকে বললেন, "ভয় করছে ?"

পুষ্পদি বললেন, "হুঁম, মা, গাটা ছম্‌ছম্‌ করছে।"

মা বললেন, "সকলকে উঠিয়ে দে।" মাও প্যাণ্ডেল থেকে চলে এলেন। পুষ্পদিকে রাসলীলার চৌকী দেখিয়ে বললেন, "ঐখানে শুইয়ে এলাম।"

পুষ্পদি কিছুই বুঝতে পারেন নাই ! পরদিন শোনা গেল রাহুলদা মারা গেছেন। রাত্রিতে রাহুলদা জ্যোতির্ময় দেহে মার কাছে এসেছিলেন।

১৯৬৩ সন

কাশীতে মামু দুর্গাপূজা করালেন। আমি পূজার কাজ করছি। মহালয়াতে ঘট স্থাপন হল। মামুর শিব মন্দির। মা ও দিদিমা মন্দিরের সামনে চৌকীতে বসে আছেন। দাদাভাই, শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্তী, কন্যাপীঠের মেয়েরা এবং বহু ভক্ত পূজাতে বসেছেন। শরৎ-কালের প্রভাতে মাতৃ-সান্নিধ্যে পূজাতে খুব আনন্দ হচ্ছিল।

মা আমাকে বেদপাঠ করতে বল্লেন। পুরুষ-সূক্তটি শুনে ত্রিপুরারি বাবু সংস্কৃত উচ্চারণের ভূয়সী প্রশংসা করলেন। উনি আবার ভুলও ধরলেন। আমি আবার সংশোধন করে দিলাম। উনি আমার উত্তর শুনে খুব খুসী হলেন। মাও খুব আনন্দ প্রকাশ করলেন। মাকে দেখে মনে হল মায়ের মেয়ে যেন রাজ্য জয় করে এসেছে।

ত্রিপুরারি চক্রবর্তী রামায়ণ ও মহাভারতের উপর প্রতিদিন ভাষণ দিতেন। মা বলতেন—"ত্রিপুরারি বাবা যখন রামায়ণ কথা বলে সেই সময়টা বাবা যেন চলন্ত রামায়ণ। বাবা যখন মহাভারত কথা বলে সেই সময়টা বাবা যেন চলন্ত মহাভারত।" অন্য একদিন মা বলছিলেন, "বাবার অমৃত কথা। এমন ভাবে কেউ শোনায়নি, শোনাবেও না।"

মহাসমারোহে দুর্গাপূজা হল। লক্ষ্মীপূজাও খুব ধুমধামে সঙ্গে হল। বহু ভক্ত সমাগম হয়েছিল।

কাশীর আশ্রমে গোপালের জন্য চন্দন কাঠের সিংহাসন এসেছে। জন্মাষ্টমীর দিন গোপাল সিংহাসনে বসলেন। রাত্রি ১২টার পর গোপালের পূজা শুরু হল। দুধ, দধি, ঘৃত, মধু দিয়ে গোপালের স্নান হল। মা পূজাতে গোপালের সামনে বসে রইলেন। রাত্রি ১২টার সময় পুষ্পদি গান ধরলেন—

"কিবা ঘোর নিশায়,—
জীবগণ যত আলসে ঘুমায়।
নিখিল জগৎ ঝিল্লিরাবাবৃত
এমন সময় পতিত পাবন,
জগৎ জীবন ব্রহ্ম সনাতন।
ত্যাজিয়া সাধের বৈকুণ্ঠ ভূবন
অবতীর্ণ হতে আসিলেন ধরায়॥
কিবা ঘোর নিশায়—

সময়োপযোগী গানটা শুনে সকলেই মুগ্ধ হয়ে গেল।

প্রতি বৎসরই জন্মাষ্টমীতে গোপালের পূজা হয়। গোপালের পূজার পর প্রায় ৩টায় মা কন্যাপীঠের ঠাকুর ঘরে এলেন। আড়াইটায় গোপালের পূজা শেষ হয়েছে। মায়ের কৃপাতে এই প্রথম মায়ের পূজা করলাম। মাকে শাড়ী পরিয়ে, অলংকার দিয়ে সাজিয়ে হাতে বাঁশী দিয়ে কৃষ্ণ সাজিয়ে মায়ের পূজা করলাম। মেয়েরা খুব কীর্তন করছিল। এই নিস্তব্ধ রাত্রিতে মায়ের পূজা খুবই ভাল লাগছিল, মনে হচ্ছিল আমরা কোন অমৃত-লোকে আছি।

কন্যাপীঠের মন্দিরের সিংহাসন উদাসজী বানিয়েছেন। স্বর্ণ এবং রৌপ্য নির্মিত এই সিংহাসনটি। ছত্রও আছে। সিংহাসনে বসে মায়ের অপূর্ব শোভা হয়েছিল।

জন্মাষ্টমীর পরদিন নন্দোৎসব। মা সকলের মুখে দই দিলেন।

সকলকে দেবার পর নিজের মুখেও দিলেন। মেয়েরা দধিভাণ্ড মাথায় নিয়ে লীলা করল।

মে মাসে রাঁচীতে মার জন্মোৎসবে গিয়েছিলাম। জন্মোৎসবের পরে মার সঙ্গে জামশেদপুর, রাজগীর ও পাটনা বেড়াতে গেলাম।

১৯৬৩ সনের জুন মাস

পাটনাতে জালানের ধর্মশালাতে ছিলাম। গঙ্গার ধারে ধর্মশালা ছিল। হরিবাবা ছিলেন। প্রতিদিন রাসলীলা হত, সৎসঙ্গ হত। আমরা মার সঙ্গে গুরুদ্বারে গিয়েছিলাম। গুরুগোবিন্দের জন্মস্থান ছিল, সেখানে ব্রহ্ম কুমারীরা আসতেন। আমরা খুব আনন্দ করেছি।

১৯৬৮ সনের মে মাস

কাশীতে মায়ের ৭৩তম জয়ন্তী উৎসব হল। মায়ের জন্মোৎসবে বেদপাঠ, শ্রীমদ্ভবদগীতা পাঠ, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, শ্রীশ্রীচণ্ডীর সপ্তশ্লোকী পাঠ ইত্যাদি সারাদিনব্যাপী উৎসব হল। হরিবাবার পরিচালনায় রাধাকৃষ্ণের অভিনয় হল, রাত্রিতে সঙ্গীতানুষ্ঠান এবং সর্বশেষে মায়ের মুখনিঃসৃত অমৃতবাণী শুনবার সৌভাগ্যলাভে নিজেদের ধন্য মনে করত ভক্তরা।

১৯৬৮ সনের ডিসেম্বর মাস

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী সেবা হাসপাতালের উদ্বোধন। হাসপাতালে উদ্বোধন উপলক্ষে শ্রীমতী ইন্দিরাগান্ধী এসেছিলেন। ইন্দিরাজী যেদিন এলেন সেদিন খুব বৃষ্টি হচ্ছিল। মায়ের কৃপায় বৃষ্টি বন্ধ হয়েছিল, তা না হলে উৎসবে খুবই মুস্কিল হত।

১৯৭০ সাল

কাশীতে শিবরাত্রি উৎসব হল। সারারাত্রি প্রহরে প্রহরে মেয়েরা শিবপূজা করল। শিবের স্থান, মায়ের উপস্থিতি, গঙ্গার তট, যেন ত্রিবেণী সঙ্গম হল। মা সব জায়গায় এক একবার গিয়ে

বসছিলেন। মা কীর্তন করলেন। আমাকে মা এক প্রহর পূজা করতে বলেছিলেন, কারণ শরীর ভাল ছিল না। পূজার পর আমি মার সাথে আশ্রমের মন্দিরে মন্দিরে ঘুরলাম।

১৯৭০ সনেই কাশীতে শ্রীমদ্ভাগবতপক্ষ পারায়ণ মহোৎসব হল। "মা আনন্দময়ী সেবা হাসপাতালের" দক্ষিণে বিস্তৃত উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে প্রকাণ্ড প্যাণ্ডেল নির্মাণ করা হয়েছিল। দুটো মঞ্চ ছিল—একদিকে শ্রীঅখণ্ডানন্দজী বসতেন, অন্যদিকে মহাত্মারা বসতেন। রাধা গোবিন্দের অপূর্ব যুগলমূর্তি ছিল। প্যাণ্ডেলের উত্তর দিকে হাসপাতালের প্রাঙ্গনের ভেতরেই সুউচ্চ প্রধান তোরণের উপর ব্যাসদেবের মূর্তি ছিল। তোরণ দ্বারের দুই পার্শ্বে দুজন ব্রহ্মচারীর মৃন্ময়মূর্তি ছিল অতিথিদের সাদর সম্ভাষণ জানাবার ভঙ্গিতে। বাটুদা সকাল ৮টা থেকে সাড়ে ৯টা পর্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করতেন। বিকালে সাড়ে তিনটা থেকে ৬টা পর্যন্ত শ্রীঅখণ্ডানন্দজী ভাগবতের সুন্দর ব্যাখ্যা পরিবেশন করতেন। কন্যাপীঠের মেয়েরা ও বিভুদা সকাল ৮টা থেকে ৩টা পর্যন্ত কীর্তন জমিয়ে তুলতেন। ভাগবতে শ্রীআনন্দস্বামী, অযোধ্যার পণ্ডিত শ্রীসীতারামশরণ দাসজী, বম্বের শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীজী, বৃন্দাবনের আচার্য্য চক্রপাণিজী ছিলেন।

মা প্রত্যহ দুই বেলাই সম্পূর্ণ পাঠের সময় মঞ্চে উপবিষ্ট থাকতেন। শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিক মাঙ্গলিক সানাই বাদ্য ও ঘন ঘন শঙ্খধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠল। ধূপ, ধুনা, আরতি ও পুষ্প-বৃষ্টির মধ্যে অপূর্ব পরিবেশে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেন সত্য সত্যই ভূ-ভার হরণের জন্য মাতৃক্রোড়ে অবতীর্ণ হলেন। ত্রিপুরারি বাবু এই অনুষ্ঠান দেখে বলেছিলেন, "শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা যে এরকম হয় জানা ছিল না। মঞ্চের সামনে শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ স্থাপন করে ভারে ভারে ফল মিষ্টি সাজান ছিল। পূজার পর বাটুদা বেদপাঠ করলেন। কন্যাপীঠের মেয়েরা পুরুষসূক্ত পাঠ করল।

এবারকার ভাষণে বিশেষ লক্ষ্য করার বিষয় ছিল এই যে স্বামীজী প্রায়ই তাঁর ব্যাখ্যার মধ্যে মায়ের সদ্‌-বাণীর উল্লেখ করছিলেন। মায়ের করুণাধারা অবিরামভাবে স্বামীজীর উপরে বর্ষিত হচ্ছিল, তা না হলে এই ১৫ দিন প্রত্যহ দুবার আড়াই তিন ঘণ্টা ধরে কি করে ব্যাখ্যা করতেন ?

ভাগবত সমাপ্তিতে স্বামীজী বললেন, "একেই তো এই শ্রীমদ্ভাগবত পারায়ণ মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হচ্ছে বাবা বিশ্বনাথের অবিমুক্ত ক্ষেত্র কাশী-ধামে, তাও আবার গঙ্গাতটে মায়ের পবিত্রতম উপস্থিতিতে পুণ্যতিথি মাঘী পূর্ণিমা ও শিব চতুর্দশীর মধ্যে। এইজন্য আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে এতদিন যাবৎ যাঁরা উপস্থিত হয়ে নিষ্ঠাভরে একাগ্রচিত্তে শ্রীভগ-বানের পূত লীলা কীর্তন শ্রবণ করে এসেছেন তাঁদের পক্ষে শ্রবণের অবশ্যম্ভাবী ফল হবে।"

স্বামীজীর সুগভীর পাণ্ডিত্য, গবেষণা ও কথকতার অপরূপ ভঙ্গিমায় সকলেই মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি পূর্ণ অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর জ্ঞান গরিমায় উদ্ভাসিত হয়ে সমগ্র ভারতের সাধু সমাজের সভাপতিরূপে খ্যাতি অর্জন করেছেন। মা তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। আমরাও তাঁর বক্তৃতা শুনবার জন্য ব্যস্ত থাকতাম। এ রকম আর জীবনে শুনতে পাইনি।

১৯৭১ সনের সেপ্টেম্বর মাস

দেরাদুনে রাজাবেনের বাড়ীতে দুর্গাপূজা ও লক্ষ্মীপূজা হল। দুর্গামণ্ডপ খুব সুন্দর সাজান হয়েছিল। মণ্ডপের চারিদিকে দশ মহা-বিদ্যার অপরূপ প্রতিকৃতি দশদিক আলো করে বসেছিলেন। জন-সমাগমে মণ্ডপ মুখরিত ছিল। প্রহলাদ ব্রহ্মচারী এবং কালীসাধক ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের গান হত। আমরা এই গান শুনবার জন্য অস্থির থাকতাম। মায়ের সামনে মণ্ডপে বসে মনে হত আমরা পৃথিবী ছেড়ে যেন স্বর্গে বসে আছি। চারদিন খুব ভালভাবে পূজা হল। প্রতি-

দিন কুমারী পূজা হত। মহাষ্টমীতে অষ্টালঙ্কারে বিভূষিতা কুমারীর দর্শন করে মনে হত সাক্ষাৎ দেবী দর্শন করছি। বিজয়া দশমীতে সকলেরই মন ভারাক্রান্ত। বিসর্জনের পর কিছুক্ষণ কীর্তন হল। মা "কই উমা, কই উমা" ও "দুর্গা দুর্গা" কীর্তন করলেন।

দুর্গাপূজার পর লক্ষ্মীপূজা হল। মাকে স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিতা করে রাজা বেন (শ্রীমতী খৈতান) পূজা করলেন। মার হাতে লক্ষ্মীর ঝাঁপি এবং ধানের ছড়া ছিল। মাকে দেখে মনে হল সাক্ষাৎ দেবী স্বর্গ থেকে ধরাতলে নেমে এসেছেন। মা মণ্ডপে এসে বসলেন। লক্ষ্মী পূজা সুসম্পন্ন হল।

১৯৭১ সন

এবার বাসন্তী পূজাতে মা কাশী এলেন। মা পূজার সময় মণ্ডপে বসতেন। আমাদের কাজ যা অপূর্ণ থাকত মা পূর্ণ করে দিতেন। সন্ধ্যায় আরতির প্রদীপের আভায় মৃন্ময়ী প্রতিমা চিন্ময়ী হয়ে উঠতেন। প্রতিমা খুব সুন্দর হয়েছিল। বহু ভক্তের সমাগম হয়েছিল। মেয়েরা সমস্ত পূজার কাজ অতি সুচারুরূপে করবার চেষ্টা করত।

মায়ের শুভ জন্মতিথি কাশীতে হয়েছিল। শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী সেবা হাসপাতালের সামনে প্যাণ্ডেল বানান হয়েছিল। প্রতিদিন রামলীলা ও রাসলীলা হত। রাম-সীতার যুগল মূর্তি ছিল। প্যাণ্ডেলের নীচে হাল্কা বাদামী রং এবং হলুদ রংএর কাপড় দিয়ে শিল্পী অপরূপ সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেছিলেন। কোথাও হাল্কা নীল এবং কোথাও শ্বেত বস্ত্র দিয়ে পদ্ম ফুলের মত তৈরী করেছিলেন। এমন অপরূপ শোভা হয়েছিল যে ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। প্যাণ্ডেলে ১০৮ কুমারী পূজা হল। বটুক পূজাও হল। মা কুমারীদের মাথায় একটা করে লাল পদ্ম ফুল দিলেন। সকাল ৭টা থেকে ১১টা পর্যন্ত রাসলীলা হত, বিকালে ৩টা থেকে সাড়ে ৬টা রামলীলা হত। রাসলীলার মঞ্চে

মায়ের শুভ জন্মতিথি পূজার স্থান করা হয়েছিল। কলা গাছের খোলা দিয়ে এত সুন্দর মায়ের আসন সাজান হয়েছিল যে মনে হচ্ছিল যেন শ্বেত পাথরের কারুকার্য্য করা দরজা। মাকে আমাদের আশ্রম থেকে পাল্কী করে বাজনা বাজিয়ে শোভাযাত্রা করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। একটি চতুর্দোলায় পদ্মের মালা দিয়ে ফুলের সাজ দিয়ে সাজান ছিল। সেই ফুলের সাজে শুভ্রবসনা মা—শ্বেত পদ্মের মত শোভা হয়েছিল। শঙ্খধ্বনি উলুধ্বনিতে সভাস্থল মুখরিত হয়ে উঠল। কিছু-ক্ষণের জন্য পূজা স্থান যেন অমরাবতীতে পরিণত হল। যজ্ঞের পূর্ণাহুতি দ্বারা উৎসব সমাপ্ত হল।

১৯৭২ সালের মে মাস

দিল্লীতে মায়ের জন্মোৎসবে আমরা গিয়েছিলাম। দিল্লীর মহা-নগরীতে মায়ের উৎসব আশ্রমের কর্মীবৃন্দদের প্রচেষ্টায় অতুলনীয় হয়েছিল। শিব মন্দিরের বিশাল প্রাঙ্গণে মণ্ডপ সুসজ্জিত করা হয়েছিল। কলকাতা থেকে শিল্পী এসে মণ্ডপ নির্মাণ করেছিলেন। পাখা এবং কুলারের ব্যবস্থা ছিল। সেজন্য ভক্তদের কোন অসুবিধা হয় নি। উৎসবের উদ্‌ঘাটন সমারোহে ভারতের প্রধান মন্ত্রী মায়ের অনন্যা ভক্ত ইন্দিরা গান্ধীকে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল।

নির্মলানন্দজী ইন্দিরাজীকে ভাষণ দিতে বল্লেন।

ইন্দিরাজী বল্লেন, "এটা ভাষণ দেবার স্থান নয়। আমার মায়ের নিকট এই প্রার্থনা যে এই দেশবাসী এবং দরিদ্রদের উপর মায়ের আশীর্বাদ থাকুক্।"

প্রাতঃকালে রাসলীলা এবং সন্ধ্যায় রামলীলা হত। দূর দূর থেকে মহাত্মাদের আগমন হয়েছিল। মহাত্মারা সকাল সন্ধ্যা অমৃতময়ী বাণী বর্ষণ করতেন। এছাড়া সঙ্গীত শিল্পী কালীসাধক ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য এবং গীতশ্রী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান হত। একদিন রাত্রিতে

শ্রীচৈতন্যের পতিতোদ্ধার ও অন্যদিন সন্ন্যাস গ্রহণের অভিনয় হয়েছিল। প্রায় রাত্রি শেষ হয়েছিল, কিন্তু অভিনয় দর্শনে ভক্তরা এত মুগ্ধ হয়েছিলেন যে সময়ের কথা কারও মনে হল না। অভিনেতাগণ মাকে অভিনয় দেখিয়ে নিজেদের ধন্য মনে করলেন। তিথি-পূজার সময় বেলফুল দিয়ে মায়ের খাট সাজান হয়েছিল। মধ্যে মধ্যে লালফুল ছিল। নানা রকম ফুলের মালা ছিল। মনে হচ্ছিল পৃথিবী-মাতা নানাপ্রকার ফুলের উপহার দিচ্ছেন। সৎসঙ্গ মণ্ডপে তিল ধারণের জায়গা ছিল না। এত ভীড় থাকা সত্ত্বেও চারিদিক নিঃস্তব্ধ এবং শান্তিপূর্ণ ছিল। কৃষ্ণানন্দ অবধুতজী মাকে পূজা মণ্ডপে নিয়ে এলেন। মা মহাত্মাদের হাতজোড় করে শুয়ে পড়লেন। শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি, বেদধ্বনিতে নির্বাণানন্দজী পূজা শুরু করলেন। আরতি ও যজ্ঞের পর পূজা সমাপ্ত হল।

১৯৭৩ সালের মে মাস

হিমালয়ের মহাপুণ্যতীর্থ শত শত সাধু মহাত্মার সাধনস্থান উত্তর কাশীতে মায়ের জন্মোৎসব দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল।

উজেলীতে কৈলাস আশ্রমে মার উৎসব হয়েছিল। ১০০৮ স্বামী বিদ্যানন্দজী এই উৎসবের আয়োজন করেছিলেন। উত্তর কাশীতে দেখেছি মা সর্বদা আমাদের মধ্যে। কখনও মা প্যাণ্ডেলে বসে আছেন, কখনও মা মন্দিরে, আবার কখনও দেখ্ছি মা আমাদের রান্নাঘরে এসে উপস্থিত। , আবার রাস্তায় হেঁটে হেঁটে চলেছেন। আবার অবধূতজীর শারীরিক কুশলবার্তা নিতে মা তাঁর ঘরে গেলেন। সকাল সাড়ে পাঁচটার সময় উষাকীর্তনের পর মায়ের আরতি দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হত আর মহাপ্রভু লীলা, রাসলীলা, প্রবচন ইত্যাদি নিয়ে সারাদিন আমরা ব্যস্ত থাকতাম। রাত্রে মাতৃসঙ্গের আনন্দ উপভোগ করে কার্যক্রম সমাপ্ত হত।

শ্রীমতী শুভলক্ষ্মী গায়িকা হিসাবে আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষে এবং সাগরপারেও খ্যাতি অর্জন করেছেন। তিনিও উত্তর কাশীর এই দুর্গম পথে মায়ের জন্মোৎসবে অংশ নেবার জন্য হাজির হলেন। কোন বাজনা নেই, খালি গলায় প্রায় ২ ঘণ্টা ধরে গান গাইলেন। বেশীর ভাগ ভজন হিন্দীতে, দুএকখানা বাংলাতেও গাইলেন। জন্ম-তিথির দিন রাত্রি বারটা পর্যন্ত মাতৃসৎসঙ্গ হল। মাও সেদিন গান গাইলেন—

"কৃষ্ণ কন্‌হাইয়া বংশী বাজাইয়া, গউআ চরাইয়া, রে রে রে।" আমরা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে বসে রইলাম। ১০৮ কুমারী পূজা হল। মাকে সাজান হল কুমারীর রূপে শাড়ী ও আভরণে। মা একজন ছোট কুমারীকে ডেকে তার পাতের থেকে খাবার তুলিয়ে সেই কুমারীটিকে দিয়ে নিজের মুখে দেওয়ালেন এবং সেই খাবার খেলেন। কুমারীদের মাথায় ফুল দিলেন। ধীরে ধীরে মায়ের তিথিপূজার দিন এগিয়ে এল। মণ্ডপ খুব সুন্দর করে সাজান ছিল। মা ৩টার পর মঞ্চে এলেন। মা যখন আসছেন তখনই প্রায় সমাধির অবস্থা। মাকে নিয়ে এলেন পূজ্যপাদ শ্রীঅবধূত স্বামীজী। দুহাত জোড় করে মা শুয়ে পড়লেন। তারপর নির্বাণদা পূজা শুরু করলেন। ধূপে, ধুনায়, ফুলে, গন্ধে, স্থান-মাহাত্ম্যে, সব মিলে কি যে একটা পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল তা আমার মনে হয় আমায় মত সাধারণ লোকের পক্ষে সম্ভব নয় ভাষায় প্রকাশ করা। মার চরণে পুস্পাঞ্জলি দিয়ে উৎসব সমাপ্ত হল। মা সমাধি থেকে প্রায় বেলা ৩টা নাগাদ উঠলেন। তারপর নামযজ্ঞ হ'ল। কীর্তন শেষে মা "ধর লও ধর লও" কীর্তন গাইলেন। আমরা উত্তরকাশীতে বেশ আনন্দ করলাম। মা উত্তরকাশী থেকে আমাদের গঙ্গোত্রী দর্শনে পাঠালেন।

১৯৭৪ সনের ২৩শে ফেব্রুয়ারী

মা হরিদ্বার থেকে কলকাতা যাচ্ছিলেন। আমরা মার সাথে রওনা

হলাম। ষ্টেশনে বহু লোক স্বাগত করতে এসেছিলেন। যোধপুর পার্কে শ্রীপ্রতিভা কুমার কুণ্ডুর বাড়ীতে মা ছিলেন। মায়ের জন্য নূতন বাড়ী নির্মাণ করেছিলেন। বাড়ীর সামনে প্রায় ৫ হাজার লোকের বসার মত বিরাট প্যাণ্ডেল বানান ছিল।

২৫ তারিখ থেকে ভাগবত শুরু হল। শ্রীনারায়ণ গোস্বামীজী ৩টা থেকে ৬টা পর্যন্ত ভাগবত ব্যাখ্যা করতেন। অতি সুন্দর সুললিত মার্জিত ভাষায় ব্যাখ্যা করতেন। একদিন নামের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছিলেন, "আমরা বলি 'নাম', ভগবান বলেন 'হ্যাঁ, নামি'।" কৃষ্ণ জন্মের দিন বিশেষ করে প্যাণ্ডেল সাজান হল। সকালবেলা শ্রীমহা-নাম ব্রত ব্রহ্মচারী এবং শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্তী ভাগবত ব্যাখ্যা করতেন শেষের দিকে রাত্রিবেলা শ্রীগোবিন্দ গোপাল মুখোপাধ্যায় এবং ডঃ শ্রীমতী রমা চৌধুরী ভাগবত ব্যাখ্যা করেছিলেন। মায়ের আসা যাওয়ার সুন্দর ব্যবস্থা ছিল। মা প্রায় প্রত্যহই ভাগবতের পর ভক্ত-দের বাড়ীতে যেতেন। সেখানেও পূজা হত।

রাত্রিতে মাতৃ সৎসঙ্গ হত। একদিন মা বলছিলেন, "বিশাল রূপে তিনি প্রকট হয়েছেন।" একদিন কেউ মাকে প্রশ্ন করল, "মা ভগবানকে ডাকলে ভগবান কি সাড়া দেন?"

মা উত্তরে বল্লেন, "তোমার নাম কি?" মেয়েটি নিজের নাম বল্ল,— "স্বাতী"। মা বল্লেন, "তোমার নাম ধরে ডাকতে তুমি যে রকম সাড়া দিলে, ভগবানও সেরকম সাড়া দেন।"

কেউ প্রশ্ন করল, "মা তোমার কাছে এত লোক আসে কেন?"

মা উত্তর দিলেন, "এই শরীরতো ভিখারী, ছোট্ট মেয়ে। যেমন রাস্তায় কেউ পড়ে থাকলে তাকে সকলে আদর করে চলে যায়, সেরকমই এ শরীরকে সকলে ভালবাসে।"

৫ই মার্চ ধুমধাম করে ভাগবত সপ্তাহ শেষ হল। যোধপুর পার্কের আনন্দের হাট ভেঙ্গে মা অন্যান্য ভক্তদের বাড়ী ঘুরে মুকুন্দ ঘোষের

বাড়ীতে এলেন। একজন বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা হুইল চেয়ারে করে মার কাছে এলেন। একজন মাকে বল্লেন, "মা, ইনি আর পূজা করতে চান না।"

মা উত্তরে বল্লেন, "যতদিন শরীর থাকে তার সেবা করে যাবে। তার শরীর, তিনি যা ইচ্ছা করবেন। শরীর অসুস্থ বলে কি তার নাম করবে না?"

মা সেখানে ২ দিন থেকে ৭ তারিখে রাণাঘাটে শোভনদার বাড়ীতে গিয়েছিলেন। আমরা আগেই আগরপাড়া আশ্রমে পৌঁছেছি। মা রাত্রি ৯টায় আশ্রমে পৌঁছালেন।

৮ই মার্চ দোল পূর্ণিমা, আগের দিন হরিবাবার উৎসব হল। হরিবাবার ফটো খুব সুন্দর সাজান হয়েছিল। ২-৩ ঘণ্টা কীর্তনও হয়েছিল। দোল পূর্ণিমায় সব সময় হরিবাবা মাকে ডাকতেন।

দোলের দিন সকালবেলা রাণুদি মাকে কৃষ্ণ সাজালেন। মাথায় সবুজ রঙের কাপড় দিয়ে পাগড়ী বানিয়েছিলেন, হাতে ফুলের গয়না, মাথায় ফুলের মুকুট ও হাতে ফুলের বাঁশী ছিল। মাকে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ মনে হচ্ছিল। মায়ের শরীর আবীর আর রঙে ভরা ছিল। আমি মার পায়ে আবীর এবং রঙ দিলাম। মায়ের চরণ লাল হয়ে গেল। আমার খুব আনন্দ হল। আমি একটু সুগন্ধ আতরও মাখিয়ে দিলাম। মাও আমার কপালে অনেক আবীর মাখিয়ে দিলেন। অন্যান্য ভক্তদেরও আবীর দিলেন। সেদিন বহু লোকের দীক্ষা হল। প্রায় ২টার সময় আমরা দেশপ্রিয় পার্কে গেলাম। সেখানে মহাপ্রভুর খুব বড় মূর্তি ছিল। মা সেখানে প্রথমে গেলেন। মা সুন্দর পট নির্মিত ভবনে বসেছিলেন।

শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ মাকে খুব বড় একটা রথে করে শোভাযাত্রায় নিয়ে গেলেন। সর্বপ্রথম কীর্তন মণ্ডলী মহাপ্রভুর খুব বড় চিত্র নিয়ে

যাচ্ছিলেন, তারপর মা ছিলেন। মার রথে স্বামীজী, ভাস্করদা এবং তরুণকান্তি ঘোষ মশাই ছিলেন। মহানির্বাণ মঠ হয়ে সকলে পুনরায় দেশপ্রিয় পার্কে সমবেত হল। সেখানে মাকে ভাষণ দিতে বলা হল। মা বল্লেন, "হরি কথাই কথা, আর সব বৃথা ও ব্যথা।" মা অনেক পুরাতন গান গাইলেন।

রাত্রে মা মাখন ঘোষের বাড়ীতে এলেন। তাঁরা মাকে আরতি এবং পূজা করলেন। একদিনের জন্য তাঁরা ছাদের উপর প্যাণ্ডেল বানিয়েছিলেন। বহু লোক সমাগম হল। দীক্ষাও হল। ছবিদি গান গাইলেন। এক রাত্রি সেখানে থেকে পরদিন দুপুরে ভোগ গ্রহণ করে মা চন্দননগর রওনা হলেন। সেখানে মন্দিরে কিছুক্ষণ থেকে দেওঘর রওনা হলেন। সেখানে ৩ দিন থেকে গয়াতে গেলেন। গয়াতে কিছুক্ষণ থেকে রাত্রি ১০টায় কাশী পৌঁছালেন।

কাশীতে কন্যাপীঠে নূতন হল তৈরী হচ্ছিল। মা কন্যাপীঠ ঘুরে নূতন বাড়ীতে কোথায় কি তৈরী হবে পানুদাকে বলে দিলেন। কন্যাপীঠের হলে মায়ের ভোগ হল। ভোগের পর মা বিশ্রাম করলেন।

তারপর দিন মা চলে যাবেন। আমাকে বল্লেন, "আমার জন্য রুটি জুস বানিয়ে দিস্। জুস্ ঠাণ্ডা হয়ে গেলে ভরিস, নয়ত গন্ধ হয়ে যাবে।"

মা সকাল সাড়ে ৭ টায় একটু ভোগ মুখে দিয়ে রওনা হলেন।

১৯৭৪ সনের এপ্রিল মাস

আমরা হরিদ্বারে কুম্ভ মেলায় মার কাছে গিয়েছিলাম। এত ভীড় ছিল যে ট্রেনে পা ফেলবারও স্থান ছিল না। ১০ই দুপুরে যখন কনখল পৌঁছলাম তখন মন্দিরে শ্রীশ্রীমুক্তানন্দ গিরিজীর মূর্তি বসান হচ্ছিল। আমাদের সঙ্গে চন্দনদি নৈমিষারণ্য থেকে এসে পৌঁছেছিলেন। ঠিক মূর্তি প্রতিষ্ঠার সময় আমরা মায়ের কাছে পৌঁছেছি। চন্দনদি খুব সুন্দর

মালা গেঁথেছিলেন, মায়ের গলায় মালা পরিয়ে দিলেন।

চন্দনদিকে দেখে মা বল্লেন, "বংশের তো, ঠিক সময়ে এসেছে ধুলা পায়ে জগন্নাথ দর্শন।"

আমরা গিরিজীর মূর্তিপ্রতিষ্ঠাতে বেদপাঠ করলাম। আমরা সকলে এক এক বালতি করে চাল দিলাম।

আমাকে আর গীতাকে বেশ বড় সাদা আলখাল্লা দিয়ে বল্লেন,— "তোমরা গেরুয়া রঙ করে নিও।" কাপড়ের উপর আলখাল্লা পরে তার উপরে চাদর নিতে বল্লেন। কারণ গেরুয়া ছাড়া সাধুদের সঙ্গে স্নান করা যাবে না। শুনলাম মহন্তজী আমাদের স্নান করতে বলেছেন সন্ন্যাসীদের দলে।

বিকালে ৪টার সময় ১২-১৩ জন মণ্ডলেশ্বর এসেছিলেন। শ্রীগীতা ভারতীজীও ছিলেন। সকলকে স্বাগত করা হল। জরীর মালা, ফুলের মালা দিয়ে আরতি করা হল। মহন্তজীর অনুরোধে মা "সত্যং জ্ঞানং" এবং "হরিবোল" কীর্তন করলেন।

১২ তারিখে গিরিজীর মূর্তির চারিপাশে চাল দেওয়া হল। ১৩ তারিখে গিরিজীর মূর্তিকে জলে রাখা হয়েছিল। সেদিন দরিদ্র নারায়ণ ভোজন হল। সকলকে চাদর দেওয়া হল। তারপর শোভাযাত্রা বার হ'ল। গিরিজীর ফটোর উপর শ্বেতছত্র ছিল। আমাদের আশ্রম থেকে দক্ষেশ্বর মন্দির প্রদক্ষিণ করা হল। মাও সঙ্গে ছিলেন। খুব কীর্তন জমে উঠেছিল।

১৪ তারিখে মহাবিষ্ণুব সংক্রান্তিতে সাড়ে সাতটায় মূর্তিপ্রতিষ্ঠা হল। গিরিজীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা হল। গীতা, চন্দনদি ও আমি বেদপাঠ করলাম। সাড়ে নয়টায় গিরিজীর ভোগ হল। ভোগের পর আমরা মিছিলে রওনা হলাম। মহানির্বাণী মঠ থেকে মিছিল শুরু হল। সর্ব-প্রথম মণ্ডলেশ্বরগণ ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে সাধু ও ভক্তবৃন্দ ছিলেন।

সর্বাগ্রে "মা আনন্দময়ী" লেখা পতাকা ছিল। তারপর কীর্তন মণ্ডলী ছিল। ছবিদি, পুষ্পদি, যমুনাদি, রীণাদি, বাণীদি, বিল্বজী এবং আমি তাতে ছিলাম। আমাদের পরে মহামায়া-প্রদত্ত ধ্বজা এবং ওঁ লেখা পতাকা ছিল। নারায়ণ পালকিতে ছিলেন। নারায়ণের পিছনে ভক্তবৃন্দ, কীর্তন মণ্ডলী, তারপর মায়ের রথ ছিল। মার পিছনে ফুল দিয়ে খুব বড় অক্ষরে মা লেখা ছিল। মার দুইদিকে কেষ্ট এবং গোপাল দাঁড়িয়ে ছিল। গোপাল ছত্র ধরেছিল। ছোটন চামর ব্যজন করছিল। মার অপূর্ব শোভা হয়েছিল। রাস্তার দুইধারে অসংখ্য জনসমাগম হয়েছিল। চারিদিক্ থেকে জয়ধ্বনি হচ্ছিল "ভারতকে সাধু মহাত্মাওঁ কী জয়।"

মার সঙ্গে ব্রহ্মকুণ্ডে গেলাম। রথ থেকে নেমে মা ব্রহ্মকুণ্ডে পালকিতে গেলেন। ব্রহ্মকুণ্ডে মহন্তজী মার পূজা করলেন। মা জলে নেমেছিলেন, আমরাও সেই সময় স্নান করলাম। স্নান করে মার কাছে এলাম। আমরা রোদে হেঁটে রওনা হলাম। অনেকক্ষণ রোদে বসেছিলাম, মা আমাদের ছায়াতে বসতে বল্লেন। আমাদের পিছনে গীতা ভারতীজী ছিলেন। আমাদের মিছিল প্রায় এক মাইল দীর্ঘ হয়েছিল। আমরা সন্ধ্যা ৬টায় কনখল আশ্রমে ফিরলাম।

তারপর দিন ইং ১৫ তারিখ, ১লা বৈশাখ, শুভ নববর্ষ। সকাল থেকে মাকে সকলে প্রণাম জানাচ্ছে এবং উপহার দিচ্ছে। ১৪ তারিখে সারারাত মেয়েরা কীর্তন করেছে, দিনে ছেলেরা কীর্তন করছে। নীচের ঘরে মায়ের এবং মহাপ্রভুর ভোগ হল। কীর্তন খুব জমে উঠেছিল। বীরেনদা মাকে ক্বারবার যাবার জন্য অনুরোধ করছিলেন। মা আমার কাছে জল চাইলেন। আমি মাকে জল খাওয়ালাম। ভোগের পর মা নিজের ঘরে গেলেন। সন্ধ্যাবেলা বীরেনদা খুব কীর্তন করছিলেন।

মা "ধর লও, ধর লও" এবং "হরিবোল" কীর্তন করলেন। কীর্তনের পর মা বাতাসা দিলেন। আমরা মার শ্রীহস্তের বাতাসা নিয়ে মাকে প্রণাম করে কাশীর পথে রওনা হলাম। ট্রেণে অত্যন্ত ভীড়, ওঠা অসম্ভব ছিল। মায়ের কৃপায় আমরা মঙ্গলমত কাশী পৌঁছলাম। আমরা ১৬ তারিখে পৌঁছলাম। মা ১৭ তারিখে প্রায় ৫০ জন নিয়ে কাশী এলেন।

একদিন সন্ধ্যাতে মা শ্রীনারায়ণ গোস্বামীকে সাবিত্রী মহাযজ্ঞের কথা বলছিলেন। আমাদের উঠানের গাছ দেখিয়ে বল্লেন—

"এই যে এক একটা গাছ এবং বেদী রয়েছে এর মাঝখানে যজ্ঞের বেদী তৈরী হয়েছিল। অনেক মহাপুরুষ এসেছিলেন। খুব ভীড় হয়েছিল।" আর একদিন রাত্রে গোপালের কথা বলছিলেন। একবার গোপালের হাতে ব্যথা লেগেছিল, মা দেরাদুনে জানতে পেরেছিলেন। সেই প্রসঙ্গে কালনদির বিছানাতে গোপালের পায়ের ছাপ পড়ার কথাও বলছিলেন।

১৯ তারিখে মামুর বাড়ীতে মায়ের ভোগ হল। মামীমা মাকে শাড়ী এবং পায়ে আলতা পরিয়েছিলেন। সিঁদূর দিয়ে, হাতে সোনার বালা দিয়ে পূজা করলেন। মাকে খাওয়ালেন।

২৩ তারিখে এখানে গিরিজীর মূর্তির অন্নাধিবাস হল। ২৪ তারিখে মিছিল করে মন্দির প্রদক্ষিণ করা হল। মিছিলে গিরিজীর চিত্র, নারায়ণ এবং আমাদের ঠাকুর ছিলেন।

২৫শে এপ্রিল, অক্ষয় তৃতীয়ার শুভদিন। আমরা সকালে গঙ্গাস্নান কারে মার সামনে ঘট দান করলাম। মাকেও ঘট দিলাম। মা স্পর্শ করে হরিবাবার ঘরে রাখতে বল্লেন। আমাদের সকলের মাথায় হাত দিলেন। সেদিন ১২টা ষোড়শোপচারে পূজা হল। আমাদের বারান্দায় প্রফুল্লদি গোবিন্দ পূজা করলেন। ১২ জন ব্রাহ্মণকে ঘটদান এবং

সোনার তুলসী দান করলেন। মা কন্যাপীঠের বারান্দায় বসেছিলেন, তারপর উপরে গেলেন।

তখনও কন্যাপীঠের মেয়েদের শোবার ঘর তৈরী হয় নাই। যে হলে মেয়েরা পড়াশুনা করত সেই হলেই ঘুমাত। মায়ের আদেশে এখন নূতন ঘর তৈরী হল। সঙ্গে সঙ্গে নূতন পুস্তকালয়ও তৈরী হল। সর্ব-প্রথম পুস্তকালয়ে মার সঙ্গে আমি ঘট নিয়ে প্রবেশ করলাম। পদ্মাজীর সঙ্গে গীতা উপনিষদ নিয়ে প্রবেশ করল। পুস্তকালয়ের প্রবেশ হচ্ছে এই কারণেই বোধ হয় মা উপনিষদ নিয়ে প্রবেশ করতে বলেছেন। আর একটা ছোট ঘরও পুস্তকালয় নামে তৈরী ছিল। সেই ঘরে মা গিয়ে কিছুক্ষণ বসলেন। এর পর তিন তলায় মা উঠলেন। সেখানে ছোট হাসপাতাল ঘরে মা প্রবেশ করলেন। মেয়েরা অসুস্থ হলে তাদের পৃথক ভাবে রাখবার মায়ের আদেশ ছিল। সঙ্গে ছোট বাথরুম এবং ছোট একটা ঘরও মা করিয়েছেন।

মা বল্লেন, "তোরা এই ঘরে রুগীদের জন্য সাবু-বার্লি পথ্য বানাবি।" হাসপাতাল ঘর থেকে মা পদ্মাজীর হাত ধরে মেয়েদের শোবার ঘরে প্রবেশ করলেন। আমরা মাকে হলে বসালাম। মার চরণ ধোয়ালাম। মাকে বেনারসী শাড়ী পরিয়ে হাতে ফুলের বালা, মাথায় ফুলের মুকুট, গলায় ফুলের মালা এবং চরণে ফুলের নূপুর পরালাম। আলতা, তেল, চিরুণী ইত্যাদি প্রসাধন দ্রব্য দিয়ে মার পূজা করলাম। একটু ফল-বাতাসা ও জল মায়ের মুখে দিলাম। চরণে একটু আতর মাখালাম। মেয়েরা খুব কীর্তন করছিল। আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে মাকে দেখছি। মা খুব তাড়াতাড়ি করতে বলছিলেন। এজন্য বেশীক্ষণ মাকে সাজিয়ে রাখতে পারলাম না।

আরতির পরই মা এক কাণ্ড করলেন। আমি মাকে প্রণাম করতেই আমার মাথায় মুকুট দিয়ে মা বল্লেন, "আর অন্য মুকুট

তো পরবে না এই মুকুটই পর। এই তো শোভা, অন্য কেউ তো মুকুট পরাবে না, এইখানে যখন এসেছ।" মা গলায় মালাও দিলেন এবং মাথায় পীঠে হাত বুলিয়ে দিলেন। আমার জীবন ধন্য মনে হল। তারপর সমস্ত ষোড়শোপচারে পূজার জোগাড় করে ছবিদিকে ষোড়শোপচারে পূজার মন্ত্র বল্লাম। ছবিদি মাকে পূজা করলেন। সর্বপ্রথম ছবিদি দুধ দিয়ে মায়ের চরণ ধোয়ালেন। তারপর শাড়ী ও প্রসাধন দ্রব্য দিয়ে পূজা করে মালা পরিয়ে ফল মিষ্টি খাইয়ে মাকে আরতি করলেন। আমি পূজা করালাম, তাই মাকে অনেকক্ষণ প্রাণভরে দেখলাম।

সন্ধ্যাবেলা আমাদের পণ্ডিতজী (ভাণ্ডারকরজী) দিদিমার উপর লেখা স্বরচিত শ্লোক শোনালেন। ভাণ্ডারকরজী খুব বড় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি মায়ের বিষয়ে অনেক শ্লোক রচনা করেছিলেন। মা শুনে খুব খুসী হলেন। বিভুদা স্বরচিত গান শোনালেন। খুব সুন্দর গানও করলেন। বিভুদার গানে সকলেই মুগ্ধ হল।

২৩শে দরিদ্র নারায়ণ ভোজন হল। জনৈক ভক্ত দরিদ্র নারায়ণদের মাথায় ফুল দিলেন। সকলকে কম্বল দেওয়া হল। খুব কীর্তন হচ্ছিল। মা বসেছিলেন। সকলের খুব আনন্দ হল।

১৯৭৪ সনের ২৯শে জুলাই; একাদশী তিথি।

আজ মা হঠাৎ কাশী এলেন। এসেই মা জিজ্ঞাসা করলেন, "কোথায় মেয়েরা ঝুলন সাজিয়েছে?" মেয়েরা বল্ল—"ঠাকুর ঘরে সাজিয়েছে।"

মা—"প্রথমে গোপালকে দেখে আসি, তারপর মেয়েদের ঠাকুরঘরে যাব।"

মা মামুকে দিয়ে গোপালের দশোপচারে পূজা করালেন। গোপাল

মন্দির থেকে মা মেয়েদের ঠাকুরঘরে গেলেন। মেয়েরা মাকে সিংহাসনে বসিয়ে পূজা করল। পূজার পর মায়ের ভোগ হল। অর্চনা রান্না করল।

রাত্রি সাড়ে এগারটায় মা আমাকে দেখতে এলেন। আমার শরীর ভাল না, আমি নীচের ঘরে শুয়েছিলাম।

মা—"তুমি কেমন আছ? কি খাচ্ছ?" এভাবে আমার সমস্ত খবর নিয়ে তারপর কবিরাজজীর মেয়ের সঙ্গে কথা বল্লেন।

ঝুলন দ্বাদশী তিথিতে ভাইজীর পূজা হল। সাধু ভোজন হল। মেয়েরা রাত্রে মাকে হলে দোলনাতে বসিয়ে পূজা করল। মেয়েরা "রাই-রাখাল" লীলা করল। মার শরীর ভাল ছিল না তবুও মা কষ্ট করে মেয়েদের লীলা দেখলেন। গুণীতা সেতার বাজাল। মা শুনে বল্লেন, "বেশ সুন্দর হয়েছে।"

তারপর দিন আবার উৎসব হল, মেয়েরা মাকে দোলনাতে বসাল। মেয়েরা লীলা করল। মীনা নামে একটি মেয়ে গরু সেজে মাকে প্রণাম করল। ও শব্দ করছিল। মা শব্দ শুনে বল্লেন, "বোল্‌না ভি আতা হ্যায়?"

মা সব মেয়েদের মাথায় হাত দিলেন।

১৯৭৪ সনের ১লা আগষ্ট

রাত্রি ৯টায় মা আমাদের হলে দোল্‌নাতে বসলেন। দোলনা ফুল এবং পাতা দিয়ে সাজান ছিল। মা মেয়েদের লীলা দেখে বল্লেন, "দুই দিন পর আজ বেশ ভাল হয়েছে।" শুক্লাকে বল্লেন, "শুক্লা তো? তা না হলে এত তেজস্বিতাপূর্ণ কথা কে বলবে?"

মেয়েরা ভুট্টা দিয়ে দাড়ি বানিয়েছিল, তাই দেখে মা বল্লেন, "তোরা এর রহস্য বলে দিলি"—এই কথা বলে মা খুব হাসলেন।

মায়ের সঙ্গে আমাদের ঠাকুরও দোলনায় ছিলেন।

গুণীতার কৃষ্ণ দোলনাতে পড়ে গিয়েছিল। মা বল্লেন, "ঠাকুর নে সোচা, পূজারী আয়া নহী, ইসলিয়ে লোটপোট খা লুঁ। তু নহী থী, ইসলিয়ে ঠাকুর লোটপোট খায়া।"

গুণীতা কৃষ্ণকে মার হাতে দিল। মা হাতে নিয়ে মাথায় স্পর্শ করে বল্লেন, "মা নে পহলে গোদমে নহী লিয়া, ইসলিয়ে তো!"

মা ঠাকুরকে আদর করে আমাদের বল্লেন, "তোমরা ঠাকুর নিয়ে খেল, এটাই তো ভাল কথা।"

ঝুলন পূর্ণিমার দিন ৫টার সময় মা আমাদের ঠাকুরঘরে গেলেন। মাকে শাড়ী পরিয়ে ফুলের মালা, ফুলের মুকুট এবং ফুলের বাঁশী হাতে দিয়ে সিংহাসনে বসালাম। আমি একটু মন্ত্র বলে দিলাম। মিনু পূজা করল, কারণ আমার শরীর ভাল ছিল না। আমি মায়ের চরণ ধোওয়ালাম। চরণে অঞ্জলি দিয়ে আতর লাগিয়ে দিলাম। মাকে মালা পরালাম।

মা বল্লেন, "আমি মেয়েদের পূজা দেখতে এসেছি।" মা সিংহাসনে বসে সব ঠাকুরকে দোলনাতে দোলালেন।

পঞ্চোপচারে মায়ের পূজা হল। মাকে খুব সুন্দর লাগছিল। মা বল্লেন, "এক একজন মেয়ে এক একটি উপকরণ দিয়ে আরতি করবে।" পূজার পর মা আমাদের গলায় মালা দিলেন, মাথায় হাত দিলেন। প্রসাদ ঘরে বন্ধ রেখে অন্নপূর্ণা মন্দিরে যেতে বল্লেন। পূজার পর মা অন্নপূর্ণা মন্দিরে গিয়ে "নারায়ণ নারায়ণ" কীর্তন করলেন। অন্নপূর্ণা মন্দিরে কিছুক্ষণ থেকে গোপাল মন্দিরে গেলেন। গোপাল মন্দির খুব ভালভাবে সাজান হয়েছিল।

মা গোপালের ফটো তুলতে বল্লেন। মা প্রথমে গোপালকে দোলালেন, তারপর আমরা সকলে মিলে গোপালকে দোলালাম।

গোপাল মন্দির হয়ে রাত্রি ৯টায় মা আমাদের হলে এলেন। দোলনাতে সব ঠাকুর রেখে খুব সুন্দর সাজান হয়েছিল। মা বল্লেন, "খুব

সুন্দর সাজান হয়েছে।" মাকে পীতবর্ণের বেনারসী এবং নীল বর্ণের ওড়না দিয়ে সাজান হল, হাতে ফুলের বাঁশী দিলাম। মা খুব ধীরে ধীরে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এই কাপড় কোথায় পেলি ?"

আমি বল্লাম, "শিবাণী বুব্‌নাজী দিয়েছেন।" শিবাণীজী মাকে পূজা করলেন। মেয়েরা কংসবধ লীলা করল। লীলার পর মেয়েরা মাকে প্রণাম করতে গেল। মা মিনুর দাড়ি টেনে খুলে দিলেন এবং খুব হাসলেন।

বহুদিন আগে একবার মালাদি জাবালি মুনি হয়েছিলেন। আমি রাম সেজেছিলাম। মা মালাদির দাড়ি খুলে পড়তে দেখে বলেছিলেন, "চিরস্মরণীয় দাড়ি।"

লীলার পর মেয়েরা মায়ের আরতি করল। আরতির পর মা বল্লেন, "তুমি মাতা, তুমি পিতা, তুমি বন্ধু, সখা, স্বামী, সবই তিনি।"

আরতির পর মার হাতে মেয়েরা রাখী বাঁধল। মাও আমার হাতে রাখী বেঁধে দিলেন। বড়দের কারও কারও হাতে রাখী বাঁধলেন। অন্যান্য মেয়েদের রাখী হাতে দিয়ে মা বল্লেন, "তোমরা কাউকে দিয়ে বাঁধিয়ে নিও।" আমাদের হলে খুব ভীড় হয়েছিল। মা তাদের হাতেও রাখী দিলেন, সকলকে মা প্রসাদ দিতে বল্লেন। হল থেকে মা গোপাল মন্দিরে গেলেন। সেখানে মায়ের উপস্থিতিতে ধ্যান হল। প্রতি বৎসর ঝুলন পূর্ণিমার রাত্রে ধ্যান হয়, কারণ শুনেছি সেই দিনটা মায়ের দীক্ষার দিন।

পরদিন সকালে মা হলে গেলেন, হলে গিয়ে দোলনাতে ফল না দেখে খুব অসন্তুষ্ট হলেন। মা সব সময় দোলনা থেকে ফল ছিঁড়ে ছিঁড়ে আমাদের হাতে দিতেন। এবার মা পেলেন না। মা বিন্ধ্যাচলে রওনা হলেন। রওনা হওয়ার সময় সব মেয়েদের দিকে তাকিয়ে বল্লেন, "ভাল থেকো।"

১৯৭৪ সনের অক্টোবর মাস

আমরা দুর্গাপূজাতে কনখল গিয়েছিলাম। কনখলে পৌঁছাবার সঙ্গে সঙ্গেই মা মালাদিকে বল্লেন, "শীগ্‌গির গিয়ে কাপড় ছেড়ে এসে গান কর।" আমাকে বল্লেন, "এসেছ? বেশ, ভাল।"

দুর্গামণ্ডপ খুব বড় ছিল। প্রতিমা খুব সুন্দর হয়েছিল। ষষ্ঠীর দিন সকালে চক্ষুদান হল। মা সব ঠাকুরকে স্পর্শ করলেন। আমরা ধান দূর্বা দিয়ে বরণ করলাম। তারপর আরতি করলাম। সপ্তমী, অষ্টমীতে সুন্দরভাবে পূজা হল। অষ্টমীতে স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত করে কুমারী পূজা করা হল। নবমীতে প্রায় ২০০ জন কুমারী পূজা হল। দশমীতে যজ্ঞ হল। মা নির্বাণদাকে স্পর্শ করলেন, তখন যজ্ঞের পূর্ণাহুতি হল। মা আমাদের সকলের মাথায় হাত দিলেন। খুব তাড়াতাড়ি দশমীর পূজা হল।

মা বল্লেন, "বিশেষ পূজা হল, এত সুন্দর স্থান, স্থানের একটা মাহাত্ম্য আছে তো? দক্ষেশ্বর মন্দির, গঙ্গার তট, পূজার তো বিশেষ ফল আছেই।"

পূজার পর শান্তিজল দেওয়া হল। তারপর ছবিদি ও পুষ্পদি গান করলেন। মাও অনেকক্ষণ গান গাইলেন।

"দুর্গা দুর্গা দুর্গা দুর্গা, অরূপ স্বরূপ তুমি মা দুর্গা, ব্যক্ত অব্যক্ত তুমি মা দুর্গা, যাও নাই যাও নাই, আছ মা দুর্গা, সর্বভূতে আছ তুমি" ইত্যাদি।

গানের শেষে মা সকলকে ২ মিনিট মৌন থাকতে বল্লেন। একটু বসে মা উঠে পড়লেন। রাত্রিতে সকলকে মা মিষ্টি দিলেন।

দুর্গাপূজার পর লক্ষ্মী পূজা হল। মা সকলকে বল্লেন, "কাল সকাল সকাল বেশ সুন্দর করে রান্নার জোগাড় করে ফেলো।"

আমি—মা, আমি মণ্ডপে থাকব।

মা বল্লেন, "সকাল থেকে শুরু করো।"

খুব সুন্দর ভাবে লক্ষ্মী পূজা হল। মাকে শাড়ী পরিয়ে, মালা দিয়ে, হাতে লক্ষ্মীর ঝাঁপি দিয়ে নির্বাণদা পূজা করলেন। মাকে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীদেবী মনে হচ্ছিল। মায়ের সেই রূপ ভুলতে পারব না কোন দিন।

লক্ষ্মীপূজার পরদিন কাশী রওনা হলাম।

মা বল্লেন, "খুব সাবধানে যেও। সংযমে নীলিমাকে পাঠিও।"

১৯৭৫ সনের ২৫শে ফেব্রুয়ারী

মা সকালে কাশী এলেন। মার সঙ্গে স্বামীজী, নির্বাণদা, ভাস্করদা, পানুদা, নীলিমাদি ও ইন্দিরাজী ছিলেন। সেদিন শ্রীসত্যনারায়ণ পূজা ছিল। মাঘী পূর্ণিমার দিন প্রতি বৎসরই সত্যনারায়ণ পূজা হয়। মাকে জিজ্ঞাসা করে গোপাল মন্দিরে পূজার জোগাড় করলাম। গোপালের আরতি না হলে পূজা হতে পারবে না, তাই আরতির পর পূজা শুরু হল। মা এসে পূজাতে বসলেন।

মা আমাদের সত্যনারায়ণের পাঁচালী পড়তে বল্লেন। পূজার পর মাকে প্রসাদ এবং মালা দিলাম।

১৯৭৫ সনের ১৯শে মে

আমরা মার সঙ্গে কলকাতায় মার জন্মোৎসবে যাচ্ছি। বেনারস ষ্টেশনে ট্রেণে উঠে বক্সার ষ্টেশন পর্যন্ত মার সঙ্গে এক কামরায় ছিলাম।

মা মোগলসরায় ষ্টেশনে বল্লেন, "নৈমিষারণ্যে এত গরম ছিল, মনে হয় যেন সমস্ত শরীরে আগুন ঢেলে দিয়েছে। জল ছিল না, আলো ছিল না। তবে উৎসবে কারও কষ্ট হয় নাই। খুব ঝড় উঠেছিল। তবে কারও ক্ষতি হয় নাই।"

মেয়েরা পরীক্ষা দিয়ে মার সঙ্গে দেখা করতে ষ্টেশনে গিয়েছিল। মা সকলের কথা বল্লেন, আর মাথায় হাত দিলেন। মায়ের জন্মোৎসব চলছিল, তাই ট্রেণে ছোট চামর, ছোট শঙ্খ, সব ছোট জিনিষ দিয়ে

আরতি হল। আমরা আরতির গান করলাম। মা একটু খেলেন। আমরা প্রসাদ নিয়ে নিজেদের কামরায় চলে এলাম।

হাওড়া ষ্টেশনে বহু ভক্ত মাকে স্বাগত অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেল। আমরা বাসে করে আগরপাড়ায় পৌঁছালাম। একটি স্কুলের প্রায় ৫০ জন লালপাড় শাড়ী পরা মেয়েরা লাইন করে দাঁড়িয়ে শঙ্খ বাজাল। শ্রীপ্রকাশানন্দ স্বামীজীও ছিলেন।

খুব সুন্দর প্রোগ্রাম হয়েছিল। একদিন সংস্কৃতে নাটক হয়েছিল। একদিন মেয়েরা রামায়ণের নৃত্যনাট্য করেছিল।

তিথি-পূজার দিন রাত্রিতে প্যাণ্ডেল খুব সুন্দর সাজান হল। খুব ভীড় ছিল। মাকে প্রায় রাত্রি আড়াইটার সময় নির্বাণী আখড়ার মহন্তজী প্যাণ্ডেলে নিয়ে এলেন। মা হাত জোড় করে শুয়ে পড়লেন। পূজার সময় মনে হয় আমরা পৃথিবী ছেড়ে কোন্ অমৃতলোকে পৌঁছে গিয়েছি।

একদিন মা সারারাত প্রায় প্যাণ্ডেলে ছিলেন। দুই ঘণ্টা কীর্তন করেছিলেন। শুতে যান নাই। স্বরূপদা মাকে বিশ্রাম করতে যেতে অনুরোধ করাতে মা বল্লেন, "আমি যাত্রা করে বেরিয়েছি, আর কিছু শুনব না।"

কলিকাতা থেকে মা আসাম গেলেন। সেখানে ৮দিন থেকে তারপর কাশী এলেন। মা প্রায় ৩ দিন গাড়ীতে ছিলেন। মায়ের গাড়ী ৩ ঘণ্টা লেট ছিল।

১৯৭৫ সনের ৪ঠা অক্টোবর

সেদিন মহালয়া। কাশীর আশ্রমে দুর্গাপূজা হবে। সকাল ৭টার সময় মায়ের শুভাগমন হল। মেয়েরা আল্‌পনা দিয়ে মণ্ডপ সাজিয়ে রেখেছিল। পাঁচটি মেয়ের হাতে পাঁচটি শঙ্খ একত্র বেজে উঠে মহামায়ার আগমন বার্তা ঘোষণা করল। কুমারীগণের বেদধ্বনিতে আশ্রম প্রাঙ্গণ মুখরিত হল। মা এসে চণ্ডী মণ্ডপের সামনে বসলেন। মেয়েরা

আশ্রমের গাছ থেকে শিউলি ফুল তুলে মালা গেঁথে রেখেছিল। মাকে পরাল। মা বললেন, "মেয়েরা গাছে জল দেয়—নিজেদেরই গাছের ফুল। এই ফুল দিয়ে ভগবতীর পূজা হবে।"

নারায়ণ স্বামীজী বল্লেন, "মা, একটি প্রতিমা ভুল করে বেশী তৈরী করা হয়েছিল রামকৃষ্ণ মিশনের জন্য। সেখানে দরকার হয়নি। সেই প্রতিমাই আমাদের এখানে আনা হয়েছে।"

মা বল্লেন, "তিনি নিজে গড়ে আছেন। তিনি তো আছেনই।"

ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় দুর্গাদেবীর বোধন হল। ষষ্ঠী থেকে নবমী পর্যন্ত প্রতিদিন পূজা কালে রাণুদি নিজের হাতে মাকে সুন্দর ভাবে সাজিয়ে ছিলেন। অষ্টমীর দিন কন্যাপীঠের প্রাক্তন ছাত্রী কুমারী কাজল মায়ের জন্য সুন্দর ফুলের মুকুট বানিয়েছিল। নবমীর দিন রাণুদি মায়ের হাতে ত্রিশূল দিয়ে বিবিধ স্বর্ণালঙ্কারে মাকে দেবী দুর্গা বেশে সাজালেন। সাক্ষাৎ দেহধারিণী দুর্গার সামনে মৃন্ময়ী প্রতিমায় চিন্ময়ী দেবীর আরাধনা উপযুক্ত সমারোহে সম্পন্ন হল।

মহানবমীর বিশেষ অনুষ্ঠান ছিল আমাদের স্থানীয় হাসপাতালে ১০৮ কুমারী পূজা।

অতঃপর বিজয়া দশমী। মায়ের আদেশ পেয়ে আমরা লাইন করে একে একে মা দুর্গাকে প্রণাম করে দর্পণ বিসর্জন দেখলাম। চণ্ডীমণ্ডপে সমবেত সঙ্গীত চলছিল। অগ্রণীর ভূমিকায় ছবিদি এবং পুষ্পদি। কিছুক্ষণ পরে মা কীর্তন আরম্ভ করলেন। মায়ের বহুশ্রুত "দুর্গা-দুর্গা" কীর্তনে এবার ক'একটি নূতন পদ সংযোজন করছিলেন, যেমন "অরূপ, স্বরূপ, সাকার, নিরাকার", ইত্যাদি। মায়ের কণ্ঠের সুমধুর কীর্তন মৃদঙ্গের তালে তালে খুব জমে উঠল। কীর্তনান্তে মাকে প্রণাম করার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। মা প্রত্যেকের নত মস্তকে তাঁর শ্রীহস্তের স্পর্শ দিলেন।

ক্রমশঃ ভীড় বাড়তে লাগলো। মা চণ্ডীমণ্ডপ ছেড়ে চলে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে মা আবার চণ্ডীমণ্ডপে ফিরে এলেন এবং তখন শ্রীশ্রীদুর্গা প্রতিমা ও শ্রীশ্রীমাকে নিয়ে সকলের ফটো তোলা হল।

তারপর মা আমাদের বল্লেন প্রতিমাকে বরণ করতে। বরণের পর বিকেল চারটায় দুর্গা প্রতিমার সঙ্গে আমরা বজরাতে উঠলাম। অসী ঘাট পর্যন্ত গিয়ে বজরা ঘুরিয়ে আনা হল আশ্রমের সামনে। সেখানেই প্রতিমা বিসর্জন হল।

রাত্রে মা নিজের হাতে আমাদের সকলকে মিষ্টি দিলেন।

১৯শে অক্টোবর

কোজাগরী পূর্ণিমার সন্ধ্যায় আজ শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপূজা। আশ্রমের চণ্ডীমণ্ডপে নির্বাণদা বিধিমতে লক্ষ্মীপূজা করলেন। এই উপলক্ষ্যে শ্রীশ্রীমা দয়া করে আমাদের পূজাও গ্রহণ করলেন। তাঁকে আমরা মা লক্ষ্মীভাবে পূজা করলাম। কন্যাপীঠের ঠাকুর ঘরে মাকে তাঁর রৌপ্য সিংহাসনে বসান হল। মায়ের মাথায় মুকুট, হাতে ধানের ছড়া, ঝাঁপি, সিঁদুর কৌটা ইত্যাদি দিয়ে সাজিয়ে বিবিধ উপচারে পূজা সম্পন্ন হল। উপস্থিত সকলে মাকে মালা দিলেন। মা লক্ষ্মীর বেশ-ভুষা ও লক্ষ্মীবাহন পেচক সহ শ্রীশ্রীমার ফটো তোলা হল।

পরদিন আমি শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপূজার প্রসাদী উপকরণাদি নিয়ে গিয়ে মাকে দিলাম। মা দ্রব্যগুলি আমাদের সবাইকার মধ্যে বিতরণ করলেন। আমাদের দিলেন মা লক্ষ্মীর ঝাঁপি, সিন্দুর কৌটা ও শাড়ি। দুর্গাপূজার প্রসাদী ঝাঁপি এর আগে আমি মায়ের কাছে চেয়ে নিয়েছিলাম। মাকে বল্লাম যে সেই ঝাঁপিতে আমি পূজার অর্ঘ্য রেখে দিয়েছি। মা বল্লেন, “খুব ভালো কথা, এমনি চেয়েই নিতে হয়।”

১৯৭৫ সনের ১০ই ডিসেম্বর, শ্রীশ্রীগীতা জয়ন্তী

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্কালে যে তিথিতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে

গীতার উপদেশ দিয়েছিলেন অর্থাৎ যেদিন শ্রীমদ্‌ভগবদ্ গীতার জন্ম হয়, সেই দিনটিতে আজও ভারতের বিভিন্ন স্থানে গীতা জয়ন্তী উৎসব পালিত হয়। আমাদের এখানে প্রতিবার চার দিন ব্যাপী উৎসব ও পঞ্চম দিনে ভাণ্ডারা হয়।

আজ মা সন্ধ্যায় কাশী এলেন। কাশীতে এবার গীতা জয়ন্তী উৎসব পালিত হল মায়ের উপস্থিতিতে। মা প্রতিদিন বিকেল পাঁচটা থেকে গোপাল মন্দিরে বসতেন। আমরা গীতা পাঠের মণ্ডপ গাছ দিয়ে সাজিয়ে ছিলাম। প্রথম দিন মা দেখে বললেন, "গাছপালা দিয়ে অন্ধকার করে দিয়েছে", এবং যেখানে যা রাখা উচিত, সেখানে ঠিক ঠিক ভাবে রাখিয়ে আরো সুন্দর করে সাজিয়ে দিলেন।

মার আদেশে আমি পূজা করলাম। চণ্ডী মণ্ডপে খুব সুন্দর ভাবে সাজিয়ে আমি পূজা শুরু করেছি। নারায়ণ স্বামীজী মন্ত্র বল্লেন। মা সামনে মণ্ডপে বসে আছেন। মেয়েদের কীর্তন খুব জমে উঠেছে—

"ও আমার প্রাণের ঠাকুর, আজ তোমাকে আসতে হবে বাসতে হবে ভাল। এস আমার প্রাণপ্রিয় হৃদয় করি আলো।"

এই গানটা শুনে পূজা করতে করতে আমার মন কোথায় চলে গেল। ভাষায় বর্ণনা করতে আমি অক্ষম।

পূজাতে খুব আনন্দ হল। পূজার পর মায়ের সম্মুখে যজ্ঞ করলাম। মাথায় গামছা বেঁধে যখন যজ্ঞ করছিলাম তখন খুব আনন্দ হচ্ছিল। যজ্ঞের শেষে পূর্ণাহুতির সময় মা আমার পীঠে হাত দিয়ে দাঁড়ালেন। আমি যজ্ঞের পূর্ণাহুতি দিলাম। মার স্পর্শে এত আনন্দ হয়েছিল যে সেই আনন্দ মনে করলে আজও শরীর পুলকিত হয়ে উঠে।

মন্দিরের উপরে গ্যালারিতে মেয়েরা বসে গীতা পাঠ করেছে। অন্য সকলে নীচে বসে গীতা পাঠ করেছে।

কন্যাপীঠের মেয়ে ইন্দু গীতা পাঠে যায় নাই। মা বল্লেন, "তুমি

গীতা পাঠে যাও নাই কেন? তোমার শান্তি নীচে বসে গীতা পাঠ করবে।" বিকালে ৫টায় মা গোপাল মন্দিরে বসতেন। পদ্মাজী এবং শ্রদ্ধেয় বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য ব্যাখ্যা করলেন। দুইদিন হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যাখ্যাকার এসেছিলেন। তৃতীয় দিনে নারায়ণ স্বামীজী গীতা ব্যাখ্যা করলেন। আমরাও, অর্থাৎ গীতা, শুক্লা, মিনু, গুনীতা ও আমিও যে যেমন পারলাম ব্যাখ্যা করলাম।

গীতাজয়ন্তীর সমাপ্তির দিনে মা বল্লেন, "কলাপাতার দোনা বানিয়ে তাতে মুগডাল, নারকেল, চিনি এবং মধ্যখানে নাড়ু দেবে।" ১৫ তারিখে ভাণ্ডারা ছিল, সেইথেকে রোজই বিশেষ ভোগ, বিশেষ বিতরণের পর্ব চলল। যেখানে মা, সেখানেই নিত্য মহোৎসব।

২৫শে ডিসেম্বর

আজ বড়দিন। ক'একজন বিদেশী খ্রীষ্টান ভক্ত আজ আশ্রমে এসেছিলেন। রাশীকৃত ফুলের মালা এবং মোমবাতি দিয়ে তাঁরা গোপাল মন্দিরের হলঘর খুব সুন্দরভাবে সাজিয়েছিলেন। রাত বারটায় যীশুখ্রীষ্টের জন্মমুহূর্ত। সেই সময়ে মা গোপাল মন্দিরে এলেন। তখন সাহেবরা সমবেতভাবে ধ্যান ও প্রার্থনা করছিলেন। মা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইলেন। প্রার্থনা সমাপনান্তে মা হলঘরে প্রবেশ করলেন। একজন ফটো তুলতে যাচ্ছিলেন, মা নিষেধ করলেন। ওঁরা মাকে ফুলের মুকুট, মালা, ফল, মিষ্টি, বেনারসীর টুকরা, ধূপকাঠি ইত্যাদি দিয়ে পূজা করলেন। মা প্রসাদ স্বরূপ ফল, মিষ্টি, কাপড় ওঁদের দিলেন।

আমরা পূজা অর্চনার কাজ নিজ হাতে করলে মা খুব খুশী হতেন। আমাদের উৎসাহও দিতেন পূজা, যজ্ঞ, পারায়ণ ইত্যাদি নিজে নিজে করতে। এখানে ছোট ছোট মেয়েরাও স্পষ্ট বেদমন্ত্র উচ্চারণ করে, বৈদিক ছন্দের উদাত্ত, অনুদাত্ত ইত্যাদি নিখুঁতভাবে প্রয়োগ করে, তাও

মায়েরই প্রেরণায়। মা চাইতেন আমরা সকলে কর্মভার বণ্টন করে নেই এবং সামর্থ্য ও যোগ্যতা অনুসারে কল্যাণ কর্মের সুযোগ পাই।

১৯৭৬ সনের ২রা ফেব্রুয়ারী

মা নৈমিষারণ্য থেকে কাশী এলেন। সরস্বতী পূজা হবে। মা এসে পৌঁছলেন প্রায় আটটার সময়। এসেই দোতলার ঘরে আমাকে ডাকলেন। বল্লেম, "তোমাদের পূজা, তোমরা কর। তুমি করবে, না গীতা করবে ?" আমি বল্লাম, "গীতা করবে।" মা বল্লেন, "তুমি তো গীতা জয়ন্তীতে পূজা করেছ, এবার গীতা করুক।" বলা বাহুল্য, আমাদের যাদের যাদের পৈতা হয়েছে, তাদের মধ্যে যে যখন পূজার পৌরহিত্যের সুযোগ পায়, অত্যন্ত খুশি হয়।

অবনীদাকে মা বল্লেন, "তুমি পূজা করিয়ে দিও।" আমাকে মূর্তি প্রতিষ্ঠার কাজ দিলেন।

৫ তারিখে সরস্বতী পূজা হল। মাকে রাণুদি সরস্বতী দেবীর মত হাতে বীণা দিয়ে সাজালেন। মা মন্দিরে প্রবেশ করে সরস্বতী মূর্তির পাশে দাঁড়ালেন। পরে ফটো উঠান হল। মা নিজ হাতে সরস্বতী দেবীর হাতে বীণা দিয়ে দিলেন। গোপাল মন্দিরের উপরে রাধা গোবিন্দ এবং নিতাই গৌড় বিগ্রহ বসান হল। মা বার বার আসা যাওয়া করছিলেন। সেদিন তিন তলায় যোগীভাই এর ঘরে চারটি ছেলের পৈতা হল। মা পৈতাতে অনেকক্ষণ বসলেন। গীতা সরস্বতী পূজা করল। নারায়ণ স্বামীজী মন্ত্র বল্লেন। পূজা বেশ সুন্দরভাবে হল। পাঠকজীও নিজে সরস্বতী পূজা করলেন।

মেয়েদের খুব ইচ্ছা ছিল আমাদের হলে মায়ের পূজা হয়। কিন্তু মাকে কেউ বলে নাই। আমি মাকে রাত্রিবেলা বল্লাম। তখন মা আমাকে বল্লেন, "আগে ডাকতে পারলে না ? ডাকলেই আমি এসে যেতাম।"

মা চোখ বুজে শান্ত হয়ে বসেছিলেন। কিছুক্ষণ পর চোখ খুললেন। আমরা মাকে মালা দিলাম। মাও আমাদের মালা দিলেন।

মেয়েরা মিষ্টি বানিয়েছিল, সেই মিষ্টি মাকে দেখালাম। মা বল্লেন, "বাঃ, খুব সুন্দর হয়েছে"।

মা রাণুদিকে মিষ্টি দিলেন, আমাদের ফল দিলেন।

কাজল খুব সুন্দর সাজিয়েছিল। তাই মা বিশুদ্ধাদিকে বল্লেন, "তোমার ছাত্রী খুব সুন্দর সাজিয়েছে।"

পূজার সময় ছবিদি খুব সুন্দর কীর্তন করলেন। মেয়েরা বেদ-পাঠ করল। পূজার শেষে মা বল্লেন, "কে যেন নাটক করবে ?" তখন অঞ্জনা নাটকাভিনয় করল। সুজাতা গান করল। সব বাচ্চাদের মা বল্লেন, "তোমরা এত সুন্দর সাজিয়েছ, সবাই দেখে নিয়েছে, আমারও দেখা হয়ে গেছে।"

আমি সারাদিন উপবাস করেছিলাম মাকে পূজা করার জন্য। তাই মা পূজার পর বল্লেন, "এখনই গিয়ে খেয়ে নাও দেরী করো না।" মার কথামত খাওয়া সেরে মার কাছে গেলাম। আমি যে খাই নাই তাই মার কত চিন্তা আমার জন্য।

৬ তারিখে আবার গোবিন্দের ষোড়শোপচারে পূজা হল। ভাল করে রান্না করে গোবিন্দের ভোগ হল। রাত্রে হরির লুট দিলেন। ৮ তারিখে দরিদ্র নারায়ণ ভোজন হল। ৯ তারিখে সাধু ভোজন হল। ১২ তারিখে মা দেওঘরে গেলেন। সেখানে ৩-৪ দিন থেকে কাশী এলেন।

১৯৭৬ সনের ৯ই মে

কনখলে আমরা মায়ের জন্ম উৎসবে গিয়েছি। মাকে প্রণাম করে বল্লাম, "মা তোমার সব জিনিষ এনেছি।" ১১ তারিখ থেকে লীলা অভিনয় হল। বেশীর ভাগ মহাপ্রভু লীলাই হত। ১৪ তারিখে

১০৮ কুমারী ভোজন হল। ১৫ তারিখে সারারাত্র প্রায় ১টা পর্যন্ত মহারাস হল। রাসলীলাতে মা সারাক্ষণ বসেছিলেন। আমরা রাসলীলা দেখতে দেখতে প্রায় সারারাত কাটিয়ে দিলাম। ১৬ তারিখে দক্ষেশ্বর মন্দিরে সোয়ামন দুধ দিয়ে শিবকে অভিষেক করা হল। বেশ বড় রূপার সাপ এবং ছত্র ছিল। ষোড়শোপচারে পূজা হল। মাকে স্পর্শ করে নির্বাণদা পূজা করলেন। মা ফুল মালা দিলেন।

সেদিন সন্ধ্যায় হলে মার আরতি হল। হল খুব সুন্দর করে সাজিয়ে তিথিপূজা হল। রাত্রি পৌনে ৩টায় মাকে মহন্তজী নিয়ে এলেন। মা এসে হাতজোড় করে শুয়ে পড়লেন। মণ্ডপে অন্যান্য সাধুরা ছিলেন, ব্রহ্মচারীরাও ছিলেন। সাধুদের পূজা আরতি হল। নির্বাণদা মায়ের পূজা করলেন। ভাস্করদা সোয়া মণ দুধ দিয়ে মায়ের পাদুকা পূজা করলেন। মায়ের ধ্যান হল। কুমারীপূজা হল। যজ্ঞ করে পূজা সমাপ্ত হল। বেলা প্রায় ১টা পর্যন্ত মা সমাধিতে ছিলেন। তারপর সামান্য কিছু খেলেন। মা পূজার পর খুব কম কথা বল্লেন। যারা চলে যাবে, তাদের সাথে দেখা করলেন।

তারপর দিন নামযজ্ঞ হল। রাত্রে মা মেয়েদের সাথে ঘুরে ঘুরে কীর্তন করেছেন। কীর্তন এত সুন্দর জমে উঠেছিল যে মা ভোগে বসে মহাপ্রভুর মত হাত তুলে কীর্তন করছিলেন। ভোগের পর মা সকলের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে কীর্তন করলেন। সন্ধ্যায় মার উপস্থিতিতে নামযজ্ঞ শেষ হল।

১৯৭৬ সনের ৩১শে মে

সন্ধ্যাবেলা মার মোটরে বসে হরিদ্বারে কচ্ছি আশ্রমে গেলাম। মাকে রামভাই নিয়ে যাচ্ছিলেন। পিছনের জমিটা আশ্রম ক্রয় করে নিয়েছে। সে বিষয়ে রামভাই অনেক কথা বলছিলেন। কচ্ছি আশ্রমে ডোঙ্গরে মহারাজ গুজরাটী ভাষাতে ভাগবত পাঠ করছিলেন।

মা কিছুক্ষণ ভাগবতে বসলেন। সেখানে ভীষণ ভীড় ছিল। এখনকার বক্তাদের মধ্যে শুনলাম ডোঙ্গরে মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যাতে বিখ্যাত। ভাগবত পাঠের পর প্রায় ২০-৩০ জন ভদ্রমহিলা এক সঙ্গে আরতি করলেন। মা আরতির পর উঠে গেলেন।

কচ্ছি আশ্রম থেকে মা একজন মাইজীর বাড়ী গেলেন। তিনি মাকে গরু দান করলেন। মা গাড়ীতেই বসেছিলেন। ইসারাতে মা বল্লেন, "আমি দুধ খেয়ে নিয়েছি।"

পুনরায় মাকে কচ্ছি আশ্রমে আসতে অনুরোধ করাতে মা বল্লেন, "তিনদিনের কথা ছিল, চার দিন তো বল নাই। আমি কাল চলে যাচ্ছি।"

মা যেদিন আশ্রমে ফিরে এলেন, সেদিনই স্বাস্থ্যমন্ত্রী এলেন। শিবানন্দ আশ্রমের অধ্যক্ষ শ্রীচিদানন্দজী মহারাজ মাকে আশ্রমে যাওয়ার অনুরোধ করাতে মা বল্লেন উত্তর কাশী থেকে ফিরবার পথে শিবানন্দ আশ্রমে যাবেন, যদি আকস্মিক বাধা না হয়।

পুনরায় বল্লেন, "এই বাচ্চিকে তো পিতাজী নেয় না, নিলেই যাবে।"

উত্তর কাশীতে ১০০৮ বিদ্যানন্দ স্বামীজী একটি ঘাট উদ্‌ঘাটন করবেন, সেই কারণে মার যাওয়ার কথা।

১৯৭৬ সনের ২৩শে সেপ্টেম্বর

মহালয়ার দিন দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে দিল্লী পৌঁছালাম। মাকে প্রণাম করতেই মা শারীরিক কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। এবার প্রতিপদে ঘট বসেছে। প্রতিপদ থেকে নিয়ে নবমী পর্যন্ত কুমারীপূজা হল। শাস্ত্রে নবদুর্গার বর্ণনা আছে, তাই ৯ জন কুমারীর নবদুর্গা রূপে পূজা হল। ষষ্ঠীতে বোধন হল। সপ্তমী থেকে খুব ধুমধামে পূজা শুরু হল।

মা আমাকে বল্লেন, "তুমি মণ্ডপ থেকে নড়বে না, এইখানে থাকবে।"

মাকে শাড়ী, গয়না এবং ফুলের মালা দিয়ে পূজা করা হল। মহাষ্টমী পূজা খুব তাড়াতাড়ি হল কারণ সকাল নটার মধ্যে সন্ধিপূজা, অষ্টমী-নবমীর সন্ধিক্ষণ। খুব ধূমধামে পূজা হল। শ্রীমতী ইন্দিরাজী এসেছিলেন। উনি পূজাতে বসে চণ্ডীপাঠ করলেন। পূজার পর উনি মার সঙ্গে কথা বল্লেন। এবার মা দুর্গা খুব তাড়াতাড়ি পূজা গ্রহণ করলেন। সকাল ১০টার মধ্যে নবমী পূজা সমাপ্ত হল। মায়ের রূপ বর্ণনাতীত। মাকে এত সুন্দর করে নির্বাণদা সাজালেন, কি বলব? ভোগের পর যজ্ঞ হল। মাকে স্পর্শ করে যজ্ঞের পূর্ণাহুতি হল।

সকাল ৬টায় দশমী পূজা। এত তাড়াতাড়ি কি করে ভোগ হবে আমাদের সকলেরই চিন্তা। মা আমাদের সাথে সব সময় রইলেন। মায়ের কৃপায় সব কাজই সুন্দর ভাবে সুসম্পন্ন হল।

দিল্লীতে এবার বিশেষ উৎসব হল। আমরা মহিষমর্দিণী নৃত্যনাটিকা দেখলাম। লক্ষ্মী সরস্বতী দুর্গা গণেশ কার্তিক সকলেই ছিল। খুব বড় প্যাণ্ডেল হয়েছিল। আমাদের খুব আনন্দ হল। দশমীতে বিসর্জনের পর "দুর্গা দুর্গা" কীর্তন হল। মাকে সকলে অনুরোধ করাতে মা দেখালেন, "জীভ ফুলে গেছে।" মায়ের শরীর ভাল ছিল না। তবুও অনেকক্ষণ পর মা ধীরে ধীরে কীর্তন করলেন।

"দুর্গা দুর্গা, এই মা, ঐ মা, এই উমা, ঐ উমা, অরূপ, স্বরূপ, সাকার, নিরাকার" ইত্যাদি পদ দিয়ে কীর্তন করলেন। সন্ধ্যায় সকলকে মিষ্টি দিলেন। আমরা সকলে মাকে প্রণাম করলাম। দিল্লীর প্রসিদ্ধ গায়কদের গান হল। মা আমাদের হাতে ফল দিলেন।

বাংলা দেশের প্রসিদ্ধ মিষ্টি চিড়া-জীরা। নারকেল দিয়ে চিড়ার মত করে কাটতে হয় তাই তাকে চিড়া বলা হয়। জীরার মত করেও নারকেল কাটতে হয়, তারপর চিনির রসে পাক দিতে হয়। নারকেলের মত সাদা ধবধবে হয়। মা এই মিষ্টি খুব ভালবাসতেন। দ্বাদশীর দিন রত্রে আমাকে মা বল্লেন,

"একদিনও চিড়াজীরা পাই নাই।" আমি বল্লাম—"আমি তো রোজ পাঠিয়েছি তোমাকে।" মা বল্লেন, "তুমি এমন ছেলের হাতে পাঠিয়েছ যে সে দেয় নাই। একদিন শুধু পেয়েছিলাম, তার থেকেই ইন্দিরাকে দিয়েছি।"

তার পরদিন মায়ের খুব জ্বর হল। ডাক্তাররা বিশ্রাম করতে বলায় মা বল্লেন "সকাল থেকে আসা-যাওয়া শুরু হয়, বিশ্রাম আর হয় না।"

লক্ষ্মীপূজা খুব ধূমধাম করে হল। মা লক্ষ্মীকে স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত করা হল। মায়ের মাথার উপর রূপার ছত্র দিয়ে স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত করে মায়ের পূজা হল। পূজার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মা মণ্ডপে বসে রইলেন। নির্বাণদা পূজা করলেন। মণ্ডপ থেকে আশার পর রাণুদি মায়ের পূজা করলেন। তারপর কমলাপতি ত্রিপাঠীজীর সঙ্গে মায়ের কথা হল।

লক্ষ্মীপূজার পরদিন শ্রীশ্রীসীতারাম দাস ওঙ্কারনাথ ঠাকুর মার দর্শনে এলেন। তাঁর সঙ্গে অনেক শিষ্য এলেন। মা মন্দিরের দরজায় বসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে মায়ের কথাবার্তা হল।

দিল্লী থেকে একই গাড়ীতে মার সাথে আমরা রওনা হলাম। মা নৈমিষারণ্য যাবেন, আর আমরা কাশী যাব। ট্রেনে আমার ব্যাগ চুরি হয়ে গেল। আমার মন খুব খারাপ হল। আমি মাকে বল্লাম। গীতা বলল, "মা ব্যাগটা খুব সুন্দর ছিল।" মা বল্লেন "এই জন্যই তো নিয়া গেছে।" আবার মা বল্লেন, "থেকে যা, যাস না।" তবুও মাকে প্রণাম করে চলে এলাম।

১৯৭৬ সনের ২৫শে অক্টোবর

আমরা ২৫ তারিখে সংযম সপ্তাহের জন্য গোওালে মার কাছে রওনা হলাম। দিল্লী হয়ে গোওাল গেলাম। আমরা ৪ জন এক

সাথে ছিলাম। রাস্তার দুই দিকের দৃশ্য খুব সুন্দর ছিল। অজমের ষ্টেশন, মাউণ্ট আবু ষ্টেশন, বিশেষ বিশেষ স্থান ছিল। মেহসানা ষ্টেশনে মায়ের বিশেষ ভক্ত মধুকর ভাই এবং আরো অনেকে খাবার এনেছিলেন। মায়ের কৃপায় খাওয়া-দাওয়ার কোন অসুবিধা হয় নাই।

২৮ তারিখে ভোর ৫টায় রাজকোট ষ্টেশনে নেমে বাসে করে গোণ্ডাল রাজার বাড়ী "হাওয়া মহলে" পৌছালাম। বিরাট বাড়ী ছিল আমাদের থাকার। মায়ের জন্য নূতন বাড়ী হয়েছিল। মাকে আমরা প্রণাম করতে গেলাম। মা আমাদের শারীরিক কুশলতা জিজ্ঞাসা করলেন।

২৯ তারিখে সব সাধুদের আগমন শুরু হল। রাত্রে সংযম সপ্তাহের উদ্‌ঘাটন ভাষণ হল। শ্রীবিদ্যানন্দ স্বামীজী সংযমের উপর ভাষণ দিলেন। মা প্যাণ্ডেলে বসেছিলেন। তারপর দিন থেকে সংযমব্রত শুরু হল। মা সকালবেলা আমাদের মাথায় রুমাল দিলেন। মামীমা বল্লেন, "মা জন্মান্তরের পাপ যেন কেটে যায়।"

মা শুনে হেসে বল্লেন, "দেখ, কি বলছে, জন্মান্তরের পাপ যেন কেটে যায়।"

স্বামী স্বতন্ত্রানন্দজী, স্বামী ব্রহ্মানন্দজী, স্বামী প্রকাশানন্দজী, স্বামী চিদানন্দজী, স্বামী কৃষ্ণানন্দজী, নির্বাণী আখড়ার মহন্তজী, কুরুক্ষেত্রের মহন্তজী সকলে এসেছিলেন।

যোগিরাজ নামে একজন বিদ্বান্ এবং উমা ভারতী নামে ছোট একটি মেয়েও ভাষণ দিলেন।

রাত্রিতে মা সৎসঙ্গের বিষয় নির্বাণদা ও ভাস্করদার সাথে কথা বলছিলেন।

মা বল্লেন, "অদ্বৈত তত্ত্বের উপর তো বলতে হবে, সব দিকটা তো দেখতে হবে। চিদানন্দ স্বামীজী সব ধরে ফেলেছেন," ইত্যাদি।

রাত্রিতে রাজপরিবারের সকলে মাকে প্রণাম করতে গেলেন। তাঁদের দেখে মা বল্লেন, "দো দিন বীত গয়া।"

রাণীর বোন বল্লেন, "মা, মুস্কিল কা দিন তো কল থা।"

মা শুনে হেসে বল্লেন—"কল মুস্কিল কা দিন থা। পানী কিউঁ পীতে হ্যাঁয়, তুম জানতী হো? পানী পীনেসে সারা শরীর শুদ্ধ হো জাতা হ্যায়। কোই কোই গঙ্গা পানী ধুপ মে রখকর গরম কর থোড়া থোড়া পীতে হ্যায়ঁ।" সকলের দিকে তাকিয়ে বললেন,—"বহুত কাম করনা পড়তা হ্যায় ন?"

সকলে বললেন—"নহী মা।"

১৯৭৬ সনের ১লা নভেম্বর

আমরা শ্রীচিদানন্দ স্বামীজী এবং মার সাথে ফটো ওঠালাম। আশ্রমের ব্রহ্মচারীরা এবং রাজার বাড়ীরও সকলে ফটো ওঠালেন।

রাত্রে মাতৃসৎসঙ্গে কেউ প্রশ্ন করল, "মা মহাত্মারা আজকাল বেশীর ভাগ শহরে থাকেন, জঙ্গলে থাকেন না কেন?"

মা উত্তর দিলেন, "জঙ্গলে বসে সংসারের চিন্তা করলে শহরে থাকা হল। শহরে থেকে বনের কথা ভাবলে বনে থাকা হল। ভগবান এই রূপেই সকলের কল্যাণ করেছে। তাছাড়া নিজ নিজ গুরুর কাছে জিজ্ঞাসা করা।"

মা তখন একটা গল্প বল্লেন, "এক গরীব বালক খেতে না পেয়ে ভগবানকে চিঠি লিখল। পোষ্টবাক্সে ফেলতে গিয়ে এক শেঠের সঙ্গে দেখা হল? শেঠ চিঠি দেখে নিজের বাড়ীতে গিয়ে বালকের জন্য খাবার পাঠাল এবং পড়ার ব্যবস্থা করল। ভগবান এইরূপে বালকের ভার নিলেন।"

কেউ কেউ মার মুখে "হে ভগবান" কীর্তন শুনতে ইচ্ছা প্রকাশ করাতে মা কীর্তন করলেন। কীর্তনের পর আরতি হল এবং সৎসঙ্গ শেষ হল।

সারাদিন সৎসঙ্গে ব্যতীত হল। রাত্রে সৎসঙ্গে কেউ প্রশ্ন করল, "মা, ম্যায় জব সৎসঙ্গ মে বৈঠতা হুঁ তো মন লগ জাতা হ্যায়, ঘর জানেসে মন চঞ্চল হো জাতা হ্যায়, কিউঁ?"

মা উত্তর দিলেন—"যহাঁ সবকা লক্ষ্য এক হ্যায়। জ্যায়সা মন্দির কে সামনে বিগ্রহকে সামনে বৈঠনেসে মন অচ্ছা লগতা হ্যায়, ধ্যান জমতা হ্যায়, উসী প্রকার ইহাঁ ভী সবকা লক্ষ্য এক হ্যায়, শুদ্ধ পবিত্র বাতাবরণ আউর মহাত্মাকা অমৃত বর্ষণ, বায়ুমণ্ডল পবিত্র হোতা, ইসলিয়ে ইহাঁ মন বৈঠতা। ঘরমে ওইসী পরিস্থিতি নহী হোতী।"

প্রশ্ন—প্যারী মা, আপনা প্রেম ক্যায়সে আপকো সমর্পিত করেঁ?

মা—"যদি ঠীক ঠীক ইচ্ছা হো তো উসী সময় সমর্পিত হো জাতা হ্যায়। জ্যায়সা বজায় ওয়সা সুনো। তোতলী বোলী সুননা চাহতা হ্যায়, বাবা কো বাচ্চী কা তোতলী বোলী অচ্ছা লগতা হ্যায়।"

স্বামী স্বতন্ত্রানন্দজী বল্লেন, "মা, আপকো বহুত কম সময় দেতা হ্যায়, ১ ঘণ্টা ২ ঘণ্টা দেনা চাহিয়ে। একদিন সবেরে কা পুরা সময় আপকো দেনা চাহিয়ে।"

মা বল্লেন, "বাবা, বাত লৌটা লো, এ্যায়সী বাত নহী হ্যায়।"

সৎসঙ্গের পর আরতি হল, প্রণাম মন্ত্রের পর শেষ হল।

সৎসঙ্গের পর মাকে প্রণাম করাতে মা বল্লেন, "কেমন আছো?" আমি বল্লাম—'ভাল'।

মাকে একজন প্রশ্ন করেছিল—"ক্যা বাসনা কী নিবৃত্তি যোগ সে হোতী হ্যায়?"

মা—"যোগ সে নিবৃত্তি হোতী হ্যায়।"

স্বামী স্বতন্ত্রানন্দজীর প্রতি মা বল্লেন, "বাবা নে কহা, ঘুমাকে বোলতে হ্যায়, ইসলিয়ে সীধা কহা। "বাবা জো বাত কহ রহা, জো কোই বাত হো রহা, নিত্য যোগ জো রহা, যোগি তো উসকা প্রকাশকেলিয়ে রাস্তা দিখা। এক এক সুন্দর শ্রীমুখ সে অমৃত বহ রহা হ্যায়। যোগসে হো তো পুছতে কিউঁ ? যোগযুক্ত জো জ্ঞান হ্যায়, জ্ঞানস্বরূপ হ্যায়, রহতে হুয়ে পর্দা হটানেকা তরীকা হঠযোগ, ধ্যানযোগ, ক্রিয়াযোগ— অনন্ত প্রকার।"

স্বামী স্বতন্ত্রানন্দজী - "কিস যোগসে হোতা ?"

মা—"অন্তর যোগসে। গ্রন্থিভেদ নহী হোনেসে নহী জায়গা। অন্তর যোগ কা অর্থ হ্যায়—অন্তর্য্যামী ভগবানকে সাথ জোড়না।"

স্বামী স্বতন্ত্রানন্দজী—"বস হো গয়া উত্তর।"

মা—"অপনা অপনা গুরু নে বতায়া, ভগবদ্ বুদ্ধিসে ন চলে তো দুর্বুদ্ধি, ভগবান্ সে দূর রহনা, আবাগমন রহ জাতা হ্যায়। জ্যায়সা জন্ম মৃত্যু। জন্ম হো তো মৃত্যু হোগা। স্বরূপ প্রকাশ হ্যায়, কৌন কিসকে বাত লে কর চলে ?"

স্বামীজী—"মাতাজী, আপকা ভগবদ্দর্শন কব হুয়া ?"

প্রশ্ন শুনে মা হেসে বল্লেন, "অভী ওয়সা হী হ্যায়, ন কপড়া বদলা, ন ঢং বদলা, ওয়সা কি ওয়সা হ্যায়। ইহ শরীর ভিখারী জ্যায়সা হ্যায়। বাবা সব কহতে হ্যায়, ভগবান সর্বত্র হ্যায়। ভগবান কঁহা নহী হ্যায় ? হে ভগবান, আপনী বাত তো কর রহী হ্যায় ন কেয়া বোলনেসে খুশ হোগে বাবা ? বাবা, তুম জো বোলো ওহী।"

স্বামী প্রকাশানন্দজী—"মা, ভিখারী ভগবানকা নাম হ্যায় ?"

মা—"এক বাত হ্যায়, জ্যায়সে রাম, কৃষ্ণ আদি নাম। ইহ শরীর কাভী ভিখারী নাম হ্যায়। ইসকা অর্থ বাবা সমঝায়েঙ্গে। ইয়ে শরীর সীধা কহা, তুম লোগ জ্যায়সা দেখা, ওয়সা হী হ্যায়।"

স্বামী স্বতন্ত্রানন্দজী—“মা, আপকো সাক্ষাৎকার হুয়া কি নহী।”

মা—“জবাব তো দে দিয়া, তুম জো কহো, বড়ী সুন্দর বাত হ্যায়।”

স্বামী স্বতন্ত্রানন্দজী—“মা, ম্যায় সমঝা নহী।”

মা—“বড়ী সুন্দর বাত হ্যায়, ম্যায় সমঝা নহী—এক সমঝ দিমাগ মে আয়া, দুসরা উতর গিয়া। ইহ ঠীক হ্যায়।”

প্রকাশানন্দজী—“মা, কলসে ভিখারী কহুঁ ?”

মা—“তুমহারা জো ইচ্ছা, জো কোই জো কহে ওহী ঠীক হ্যায়। ম্যায় তো কহ দিয়া, অপনা যন্ত্র তো হ্যায়, অপনা যন্ত্র কো জ্যায়সা বাজাওগে ওয়সা শুনোগে।“

প্রশ্ন—“মা, গীতাকে মাহাত্ম্য মে লিখা হ্যায় গীতা পড়নেসে লোগ চন্দ্রলোক পহুঁচতে হ্যায়। আজকল লোগ ওয়সে হী ঘুমকর আয়ে। কেবল পত্থর দেখা।”

মা—“বাবা, শাস্ত্র মে চন্দ্রলোক কিসকো কহতে হ্যায় ?”

স্বামী স্বতন্ত্রানন্দজী—“ওহ আদিত্যকে আগে চন্দ্রলোক হ্যায়, অব আপ ক্যা কহতে হ্যায় ?”

মা—“শাস্ত্র মে জো লিখা হ্যায়, উহঁা জানেকা রাস্তা নেহী।”

১৯৭৬ সনের ৩০শে ডিসেম্বর

কাশীতে শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথজী এলেন। মা গোপাল মন্দিরে ছিলেন। মা দুপুর ৩টায় আহার পর্ব সমাধা করে বাবার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। বাবাকে দেখে মা বল্লেন, “ভালই দেখছি বাবা তোমাকে।”

বাবা বল্লেন, “এখন ভালই আছি।”

মা বল্লেন, “গোপাল গিয়েছিল এ শরীরের কাছে বাবার অসুস্থতার খবর নিয়ে, আমি বলেছি শবাসনে থাকতে, আর দুধের মধ্যে এলাচ দিয়ে একটু একটু করে দুধ খেতে। শ্বাসের দিকটা ভাল ছিল না।”

শিষ্যরা মাকে জানালেন যে মায়ের আদেশ মত বাবার সেবা করা হচ্ছে।

বাবা—"মা, অলৌকিক ভাবে এই শরীর ভাল হয়েছে। ছোট-বেলায় ১৮ বছর বয়সে নিউমোনিয়া হয়েছিল, তারপর থেকে বুকে ব্যথা হয়। কিছুদিন একদম ছিল না, আবার হঠাৎ ভীষণ ব্যথা হয়েছিল, এখন ভাল আছি।"

মা অন্যদের বল্লেন, "ব্যথার চোটে নৌকা থেকে গঙ্গায় ঝাঁপ দিতে চেয়েছিল, বাবার এত কষ্ট ছিল।"

বাবা—"মাঝে মাঝে মাকে স্বপ্নে দেখি।"

মা—"বাবা আবার স্বপ্নেও দেখে।"

বাবা—"এখন আর হরে কৃষ্ণ নাম করি না, এখন শুধু রাম নাম হয়।"

মায়ের সঙ্গে কথা বলতে বলতে তিনি সকলকে জিজ্ঞেস করলেন, "গুরুপ্রিয়াদি কোথায়? ওর লেখা বই পড়ছি।"

নারায়ণ স্বামীজী বল্লেন, "দ্বিতীয়-তৃতীয় অধ্যায়ে মায়ের সমাধির কথা আছে।"

বাবা—"আমি একবার পড়েছি, আবার পড়ব।"

দাদাভাই—"আমার লেখা সার্থক হয়েছে।"

হঠাৎ বাবা চেয়ার থেকে উঠে মাটিতে বসে পড়লেন।

মা—"বাবা, বাবা তুমি আমার খাটে বস।"

বাবা মায়ের সঙ্গে খাটে বসলেন।

বাবা—"আমি সব সময় মায়ের পাশে বসি, এখন দূরে বসব কেন?"

মা—"এখন আমার কাছে বস।"

বাবা—"বাবা ভোলানাথের জন্ম সন পেলাম না।"

মা—"সন্ন্যাস জন্ম তো আছে, সেই সনটা দেখে নিও।"

দাদাভাই—"ভোলানাথের জন্মের সন নেই আমার বইতে, সন্ন্যাস জন্ম আছে।"

মা—"কৈলাস মানস সরোবরে যেদিন পৌঁছেছিলেন সেদিন স্নানের সময় জলেই সন্ন্যাস হয়েছে।" আবার বল্লেন "এখন শরীরটা ভাল না, কাশীতেই থাক। যখন যার ইচ্ছা হবে দর্শন করে যাবে এসে।"

বাবা—"যতদিন রাম নাম অন্ত না হবে ততদিন (দেহ) থাকবে।"

মা—"ঠিক কথা বাবার শ্রীমুখ থেকে বেরিয়েছে, অমৃত ততদিন থাকবে।"

বাবা হেসে বল্লেন, "যতদিন এই শরীর থাকবে ততদিন।"

মা—"বাবা ষ্টেশন থেকেই আমি তোমার কাছে যাচ্ছিলাম কিন্তু পরমানন্দ নিষেধ করল রাস্তাও ভাল ছিল না, শরীরও ভাল ছিল না। কাল রোদে একটু মালিশ করছিলাম।"

বাবার এক শিষ্য মাকে প্রার্থনা জানালেন, "মা, আপনি বলেছিলেন বাবাকে বলতে, বাবা যেন নিজের শরীরটা দেখে এখন আপনি বলে দিন।"

মা—"বাবা, তুমি নিজের শরীর ভাল করার চেষ্টা কর।"

বাবার শিষ্য বল্লেন, "সন্ধ্যা তো হয়ে গেল।" এই কথা শুনে বাবা উঠে গেলেন। বাবার সঙ্গে সঙ্গে মাও উঠলেন। বাবার নিষেধ সত্ত্বেও মা উঠে দাঁড়ালেন এবং ঘর থেকে সিঁড়ি পর্যন্ত এলেন। বাবা চেয়ারে করে চলে গেলেন। মা ভাস্করদাকে দিয়ে বাবার হাতে ফল স্পর্শ করিয়ে মোটর পর্যন্ত পৌঁছে দিতে বল্লেন।

রাত্রে বহু লোক মায়ের দর্শন করল।

৩১শে ডিসেম্বর

কন্যাপীঠের মেয়েদের ক্ষমাদি দেখাশোনা করতেন। মেয়েদের

সেবার ত্রুটি ছিল না। মা বলতেন, "এরকম সেবা আর দেখা যায় না।" ক্ষমাদির বাবা গিরীনদা মার সাথে কথা বলছিলেন।

মা—"শরীর, যা সরে যায়।"

গিরীনদা—"আমি ছাড়তে গেলে জীভ বেরিয়ে যাবে।"

মা—"যা কিছু পাওয়া যায় না, তাই পাওয়া।"

গিরিনদা—"মনটা কোথা থেকে আসে?"

মা—"জঙ্গলের মধ্যে পাখীর বাসা। ফ্যাসাদ, সবখানে ফ্যাসাদ। ফাঁসনেওয়ালা মনহী ফ্যাসাদ।"

গিরীনদার সঙ্গে কথা বলার সময় ভাইয়া এলেন। মা ভাইয়াকে দেখে বল্লেন, "ইহ ক্ষমাকা পিতাজী।"

গিরীনদা—"কাজ করে না যে সেই ভাল।"

মা—"যতক্ষণ মন কাজ করবে ততক্ষণ ভাল। তুমিও বল আমিও বলছি। কথা বোঝা, মানে মন বোঝা। বোঝার পারে, যেখানে যাওয়া নাই, আসা নাই।" হিন্দিতে মা বলতে শুরু করলেন—"এক সামান উঠায়া এক উতার দিয়া। এক উঠায়া, এক লিয়া।" হরি হরি তিন বার বল্লেন। "মা অহংকার যুক্ত আবরণ হটানে কা অপনা ক্রিয়া। ম্যঁয়নে দরবাজা মে পর্দ্দা লগায়া, হটানা পড়েগা। পর পর, দিন দিন, সাল সাল, ক্ষণ ক্ষণ, পর্দ্দা লগানেকা। ঠীক লক্ষ্য নহী চাহতে হুয়ে ভী অখণ্ড প্রকাশ হো রহা। অহং ক্রিয়া লেকর ভগবান খেল কর রহা। মেরে কো পানা। জো ম্যঁয় ম্যঁয় করকে খুশী হোতা ওহ নষ্ট হো জাতা হ্যায়। ন ইষ্ট। ইসলিয়ে ইস রাস্তে সে মেরেকো পাওগে। ইসসে আখিরী পর্দা হটাওগে। ঘরকা দরজা খোলনে পাওগে। কল্পনা মাত্র সৃষ্টি। উনকে বিনা কাম নহী।

"জব পাঁচ মাহিনা কা পেটমে থা, প্রাণবায়ু সঞ্চার কিয়া। প্রাণ মানে শব্দব্রহ্ম, অক্ষরব্রহ্ম। মন্ত্র দে রখা ভগবান্। ওহী মন্ত্র ন হো

তো শরীর নহী চলতা।” শ্বাস নিয়ে বল্লেন, “ওহী মন্ত্র সোতে সময় ভী অখণ্ড চলতা হ্যায়। রাত মে নিদ্রা অচ্ছী তরহ সে হুই, দিমাগ কাম কর রহা, নহী তো মন খারাপ হোতা। মন ত্রান হোনে কে লিয়ে জো দীক্ষা লেতে হ্যায়, উসী বখত কা সংযোগ হোনে কে লিয়ে। বাত য়হী হ্যায়, নিত্য মন্ত্র জো চল রহা উসকে লিয়ে দীক্ষা। অক্ষর ব্রহ্ম, শব্দব্রহ্ম, স্বয়ংপ্রকাশ। অধিকার নহী হোনে সে নহী হোতা। জপ ধ্যান করনা, গ্রন্থিভেদ করনা, পর্দা হটানা, ইসলিয়ে গৃহস্থাশ্রম। ঋষিকন্যা ঋষিপন্থা জো থা, জহাঁ গোত্র গুতি হুই, সংকল্প বিকল্প বহী হ্যায়। হর সময় জপ করনা, সাফ করনা, বর্তন গন্দা রহতা হ্যায় না।

“এক নে কহা, দেখো ভগবানকা ফোটো তৈয়ার করদো। য়হ দীবাল হ্যায় ইসমে জো বড়িয়া বনাওগে, উসকো ইনাম মিলেগা। বীচ মে পর্দ্দা দে দিয়া। এক নে বহুত সুন্দর চিত্র বনায়া। এক বুঢ্ঢা থা। ওহ পালিশ করতা থা চিত্রকে লিয়ে। কল দিন হ্যায়। বহুত বড়া চিত্র হুয়া। বহুত সবেরে পর্দা খোল কর দেখা দিয়া। বহুত সুন্দর চিত্র থা। দুসরা বীচ রাতমে বৈঠ গয়া। সবেরে সব আয়ে তো বহ পর্দ্দা খোল দিয়া। পর্দ্দা খোলতে হী উসকা চিত্র দিখাই দিয়া। অপেনেকো পালিশ করো। চিত্র বহুত সুন্দর থা। উসকা প্রতিবিম্ব থা। অব কহো কিসকো পুরস্কার মিলনা চাহিয়ে? পুরস্কার কে পাবে? কাকে দেওয়া উচিত? তোমাদের কি মত?”

কেউ বলল—“যে পালিশ করেছে সে পাবে।”

গিরীনদা—“কর্তার যাকে ইচ্ছা। মনকে যে তুষ্ট করিয়েছে, এ রকম কাউকে দেখলাম না।”

মা গিরীনদাকে সকলের কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করলেন। মার সাথে অনেক ক্ষণ কথা বল্লেন। মা কথা শুনে বল্লেন, “কথার গড়নটা আটঘাট।”

১৯৭৭ সনের ১লা জানুয়ারী

অনেক লোকের দীক্ষা হল। মা চণ্ডীমণ্ডপে অনেকক্ষণ বসে রইলেন। মা সকলকে দীক্ষার বিষয়ে উপদেশ দিলেন। চণ্ডীমণ্ডপ থেকে মা হাসপাতালে গেলেন। সেখানে দুটি হোমিওপ্যাথিক বিভাগের উদ্বোধন হল। মায়ের পূজা হল। হাসপাতালের সিষ্টাররা মাকে মালা দিলেন।

হাসপাতাল থেকে মা শক্তিদার বাড়ীতে গেলেন। সেখানে বাড়ীর সকলে মায়ের পূজা করল। মা সকলের হাতে মিষ্টি দিলেন। শক্তিদার বাড়ী হয়ে মা আশ্রমে এলেন। মা শক্তিদার বাড়ীর সকলকে প্রসাদ নিতে বল্লেন। শক্তিদার ভাইএর ছেলেকে বল্লেন, "তুমি নাম করবে, কাউকে বলবে না।"

সন্ধ্যায় বারাণসীর কলেক্টর, কমিশনার এবং হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এলেন মার দর্শনে। তাঁদের সঙ্গে মায়ের কথাবার্তা হল। মা সকলকে ফল দিলেন।

জনৈক ভক্তের একটি ছোট মেয়েকে মা বল্লেন, "তোমার যে নাম ভাল লাগে সকালে সন্ধ্যায় করবে। কাউকে বলবে না।" মা আরো বল্‌লেন, "কোন পুরুষের দিকে তাকিয়ে কথা বলবে না। আদান প্রদান করবে না, স্পর্শ করবে না।"

মা সমস্ত ভক্তদের কুশল জিজ্ঞাসা করলেন।

৩রা জানুয়ারী

আশ্রম থেকে কিছুদূরে পুষ্পদির বোন বাড়ী কিনেছেন। মা সেই বাড়ীতে গেলেন। আমি মায়ের পূজা করলাম। মা পূজা শুরু করিয়ে আশ্রমে চলে এলেন, কারণ ভাইয়া চলে যাবেন।

মা বললেন, "তুমি নিবেদন করে দেও আর আসনে বসে জপ করো। পুষ্প, তুমি সকলকে প্রসাদ দিয়ে দাও, পরে আসব। কীর্তন কর।"

মা আশ্রমে কাজ সেরে আবার গেলেন। আমাকে বললেন—"খাবার ফেলে এসেছি, তাড়াতাড়ি কর, বেশীক্ষণ সময় দিতে পারছি না। পুষ্প ভাল সময়ে যেন আমি যেতে পারি।"

আমি খুব তাড়াতাড়ি পূজা করলাম। মা আমার মাথায় ও পিঠে হাত দিলেন। ফল মিষ্টি দিলেন।

পুষ্পাদির বোনের মেয়ে রিনি বলল, "মা, বাবা ও দিদার আত্মার শান্তি দাও।"

মা—"তুমি ভাল মেয়ে হলে বাবা শান্তি পাবে।" পূজার পর মা বাড়ীটির প্রশংসা করলেন। বাড়ী থেকে আসার সময় মা বললেন, "আসি গো পুষ্প।"

মা সৎসঙ্গে বললেন, "নিজের হাত, পা, পলক সবেতে যা কিছু কাজ হচ্ছে তাঁরই ক্রিয়া। সব কাজে যে কোন অবস্থায় তাঁকে স্মরণ করা, তাঁর কাজে সব সমর্পণ করা। বর্হিজগতের রস আস্বাদন করতে গেলে ক্লেশ পেতে হয়। নিজের গতি নিজেকেই করতে হয়। নিজের ঘরের রাস্তা নিজেকেই বানাতে হয়।"

১৭ই জানুয়ারী

আমরা এলাহাবাদে কুম্ভে গেলাম। আমরা তাঁবুতে ছিলাম। অখণ্ড রামায়ণ হচ্ছিল। মা রামায়ণে বসে একটু কীর্তন করলেন। রামায়ণের পর মা ভোলাগিরি আশ্রমে ছিলেন। রাত্রে মায়ের কাছে উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল এসেছিলেন। রাজ্যপাল যাওয়ার পর মা আমাদের স্নানের ব্যবস্থা করলেন। সেখানকার ব্যবস্থাপক স্বরূপজীর সঙ্গে কথা বললেন।

১৯ তারিখে ভোর ৫টায় আমরা নিরঞ্জনী আখড়ায় গেলাম। মা মোটরে ছিলেন। আমরা বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে হেঁটে রওনা হলাম। মা পালকীতে রওনা হলেন। মার সঙ্গে ভাস্করদা, স্বামীজী আর উদাসজী ছিলেন। রাস্তার দুই ধারে জনসমুদ্র ছিল। তারা মায়ের জয়ধ্বনি দিচ্ছিল। সকলের মাথায় হলুদ রঙের রুমাল ছিল। মায়ের গলায় সুন্দর মালা ছিল।

মায়ের অপরূপ শোভা হয়েছিল। আমাদের আগে ১০০৮ প্রকাশানন্দজী, ১০০৮ বিশ্বরূপ স্বামীজী ও অন্যান্য মণ্ডলেশ্বররা ছিলেন। আমাদের বিরাট দল ছিল। আমরা মার সঙ্গে জলে নেমেছিলাম। আমরা তাড়াতাড়ি স্নান করলাম। স্নান করে মায়ের কাছে এলাম। সব মেয়েরা স্নান করে আসে নাই, তাই মা সকলকে তাদের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। সব মেয়েদের স্নানের পর মা রওনা হলেন।

বিকালে মা আমাকে এবং গীতাকে মুণ্ডন করতে বললেন। আমি বল্লাম—"মা মাথায় খুব ঠাণ্ডা লাগে, কি করব?" মা—"ব্রাহ্মণের কাজ তো করতেই হবে, পৈতা নিয়েছো, নিয়ম তো করতেই হবে। চুল ফেলে স্নান করিস না, গরম জল দিয়ে মাথা মুছে নিস্। কৃপালকে সঙ্গে নিয়ে যাস্।"

মুণ্ডন করে মায়ের কাছে গেলাম, মা মোটরে করে বাইরে যাচ্ছিলেন, যেতে যেতে বল্লেন—

মা—"গরম জলে স্নান করেছো?"

আমি—"না, গঙ্গাতে মাথা মুছে চলে এসেছি।"

মা—"শিখা রেখেছ?"

আমি—"হ্যাঁ, এই দেখ", বলে মাকে দেখালাম।

সকলে বৃষ্টিতে ভিজেছিল তাই মা সকলকে মিশ্রীর জল খেতে বল্লেন।

রাত্রে মাকে প্রণাম করতে গেলাম।

আমি—"মা সরস্বতী পূজাতে থাকব?"

মা—"আগে বল, তোমার শরীর কেমন আছে?"

আমি—"এমনিতে ভাল, তবে ভীষণ ঠাণ্ডা লেগেছে। আমাদের তাঁবুতে জল হয়ে গেছে।"

মা—"তুই থাক্, অরুণাকে আমি ৫০০৲ টাকা দিয়েছি। সেই টাকা দিয়ে খই নাড়ু বেশী করে বানিয়ে সুধীরকে দিয়ে গাড়ী চালিয়ে নিয়ে

আসবি। খই এর মোয়া আগের দিন করবি, দুধ দিয়ে গুড় জ্বাল দিবি, বুঝলি? কাউকে বলিস না।"

আমি—"মা, চন্দনদি আছে ও করতে পারে।"

মা—"সব তো বলে দিলি।"

মা গীতাকে বল্লেন—"নির্বাণী আখড়ায় একটু বেদপাঠ করতে পারতে।"

সরস্বতী পূজাতে আমাকে আর মালাদিকে থাকতে বল্লেন। রাত্রে মা কলকাতার ভক্তদের বলছিলেন. "যারা যারা টাকা দিয়েছে তাদের জন্য ঘর বানান হয়েছে। এখন তো সব কিছুতেই টাকা দিতে হয়। এ শরীরের খেয়াল ছিল, তোমরা এসে একটু স্নান করে যাও।"

চিত্রা ঠাকুর ও ভবানীদি মাকে বলল, "মা, আমাদের বাস চলছিল না, খুব খারাপ রাস্তা ছিল, আমরা সারাক্ষণ নাম করেছি।"

মা—"নাম করেছ, ভাল কথা। ড্রাইভারের ঘুম এসে যেত, তাই ড্রাইভার কীর্তন করতে বলেছিল।"

স্নানের পর আমরা মায়ের রথ ধরে হেঁটে এলাম। মা নিরঞ্জনী আখড়াতে এলেন, সেখানে মায়ের পূজা হল। আমরা সেখান থেকে মোটরে ফিরলাম।

সকলকে স্নানের জল দিলাম। মেয়েরা সকলে স্নান করেছে, কিন্তু পদ্মাজীকে বলা হয় নাই, তাই মা অসন্তুষ্ট হলেন।

মা—"তোমরা বল নাই কেন? তোমাদের কাজ তো সব উনি করেন এখন তোমরা বল্লে না। যাও, ডেকে আন।"

গুণীতাকে বল্লেন পদ্মাজীকে ডাকতে। তারপর মা অন্যান্য ভক্তদের সাথে পদ্মাজীকে স্নান করতে পাঠালেন। মা বিকালে ভারত সেবাশ্রমের ক্যাম্পে গেলেন। সেখানে ছবিদির গান হল।

মা হঠাৎ আমাকে কাশী যেতে বল্লেন, কারণ গোণ্ডালের রাজা-রাণীর কাশী আসার কথা।

মা—"তুমি কাশী যাও, ওদিক্‌টা সামলাতে হবে। তোমার কাজ আছে, যাও।"

আমি প্রণাম করে চলে এলাম। মা আমাকে ডাকলেন। উদাসজীর কম্বল দেখিয়ে মা বল্লেন,

"তোমার যেটা ইচ্ছা নিয়ে নাও। আর গোণ্ডালের রাজা-রাণী যাচ্ছে, খুব যত্ন নেবে। অন্নপূর্ণা মন্দির, গোপাল মন্দির, তোমাদের মন্দির সব জায়গায় মালা দেবে। ওদেরকে মালা এবং প্রসাদ দেবে। মেয়েদের পরিষ্কার রাখবে। থাকবার যত্ন নেবে। পানুকে মনে করিয়ে দেবে গৌরীপীঠ বানাবার কথা।"

মায়ের আদেশমত কাশী চলে এলাম। গোণ্ডালের রাজা-রাণী কন্যাপীঠ দেখে খুব প্রসন্ন হলেন। তারপর আবার ২৩ তারিখে এলাহাবাদে সরস্বতী পূজার জন্য রওনা হলাম। যখন পৌঁছলাম, মা বল্লেন, "কাঁসরঘণ্টা আছে ?"

আমি মাকে প্রণাম করে বল্লাম, "হাঁ, কাঁসর-ঘণ্টা আছে।" সরস্বতী প্রতিমা এলেন। আমরা বরণ করলাম। মা বরণের সময় আমাদের পিছনে দাঁড়ালেন। রাত্রে মা নিজে এসে পূজার জোগাড় করালেন। সমস্ত জিনিষ মণ্ডপে আনালেন। পাহারাদার রাখতে বল্লেন।

আমাকে মা বল্লেন, "তোমরা এক কাজ কর, ফল ধুয়ে সাজিয়ে দাও। গঙ্গাজল ভিতরের ঘরে রাখ। ওখানে নৈবেদ্য করবে। তাড়াতাড়ি যাও।" মায়ের কথামত রাত্রি ২টা পর্যন্ত ফল-মিষ্টি সাজালাম।

২৪শে ভোর পাঁচটায় শোভাযাত্রায় বার হলাম। মায়ের রথে উঠবার সময় বেদপাঠ করলাম। নির্বাণী আখাড়া থেকে মা রথে উঠলেন। সর্বপ্রথম নাগা সন্ন্যাসীর দল, তারপর মণ্ডলেশ্বরের দল, তারপর পতাকা হাতে আমাদের ব্রহ্মচারীগণ ও তারপর মেয়েদের দল ছিল। আমাদের পর পালকীতে নারায়ণ ছিলেন, নারায়ণের পর

মায়ের রথ ছিল। রথে মায়ের অপূর্ব শোভা হয়েছিল। আমরা সকলে কীর্ত্তন করছিলাম। আমি মার সাথেই স্নান করলাম। মা জলে নেমে সকলকে জল ছিটালেন। মায়ের হাতের জল নিয়ে স্নান করলাম। তারপর মার সঙ্গে আশ্রমে ফিরলাম। রাস্তায় ছবিদি ও পুষ্পদি কীর্তন করছিলেন। মা আমাদের দেখে মিষ্টি মিষ্টি হাসছিলেন।

নির্বাণী আখড়া থেকে ব্যাণ্ডপার্টি বাজিয়ে মাকে আশ্রমে আনা হল। আশ্রমে এসে বেদপাঠ করলাম। মহন্তজী মাকে রথ থেকে নামালেন। মা মহন্তজীকে মালা দিলেন।

আমরা খুব তাড়াতাড়ি সরস্বতী পূজার জোগাড় করলাম। মা নিজে এসে মিষ্টি সাজালেন।

রাণুদি মাকে সরস্বতী রূপে সাজালেন। মা ফুলের বীণাতে হাত নাড়িয়ে নাড়িয়ে বাজাচ্ছিলেন এবং মৃদু মৃদু হাসছিলেন। নির্বাণদা মাকে অনুরোধ করলেন সকলকে দেখাবার জন্য। মা সকলকে দেখালেন। সকলে মাকে সরস্বতী বেশে দেখল। ছবিদিও সরস্বতীর প্রতিমা বানিয়েছিলেন। পাঠকজীরও সরস্বতী পূজা প্রত্যেক বার হয়। তাই মা বল্লেন, "তিন জনের পূজা একসঙ্গে হল -- এ একটা রেকর্ড থেকে গেল। তারপর ভোগ হল, যজ্ঞ হল, পূর্ণাহুতি হল। সরস্বতী পূজার প্রসাদে ক্ষীরের বুড়োবুড়ী ছিল। মা মহন্তজীকে দিয়ে বল্লেন, "ম্যয়নে সোচা বুড্ঢাকো বুড্ঢা দো, দেখো বুড্ঢাকা বাল নহী খা লেনা," এই বলে মা খুব হাসলেন। ক্ষীরের বুড়োর চুল তুলো দিয়ে তৈরী হয়েছিল। মা সকলকে প্রসাদ দিলেন। পরদিন সরস্বতী দেবীর সঙ্গে মা ফটো ওঠালেন। আমি আর রাণুদি মার সঙ্গে ফটো ওঠালাম। আমরা মাকে প্রণাম করাতে মা আমাদের হাতে ফল দিলেন। মা আমাকে নারায়ণ নিয়ে আসতে বল্লেন, মায়ের আদেশে মায়ের অনেক জিনিষ নিয়ে কাশী রওনা হলাম। মায়ের মোদিনগর হয়ে কাশী আসার কথা।

১৯৭৭ সনের ৩রা ফেব্রুয়ারী

মাঘী পূর্ণিমার দিন। প্রতি বৎসর এই দিনে সত্যনারায়ণ পূজা হয়। এবার বৃহস্পতিবার ছিল, তাই ঠাকুরঘরে লক্ষ্মীপূজা করলাম। প্রতি বৃহস্পতিবার আমরা লক্ষ্মীপূজা করি। এবার আবার পূর্ণিমা ছিল, তাই মনে মনে ঠিক করলাম মাকেও একটু পূজা করব। মার শারীরিক অসুস্থতার জন্য পূজাতে আসতে পারেন নাই। সত্যনারায়ণ পূজাতে মা ফুলের তোড়া পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সত্যনারায়ণ পূজার পর মাকে পূজা করার ইচ্ছা, কিন্তু মায়ের কাছে এত ভীড়, পূজা কিছুতেই করতে পারছি না।

চিত্রাদি মাকে বল্লেন, "জয়া সারাদিন না খেয়ে আছে ও পূজা করবে।" তখন একটু ঘর খালি হল। আমি মাকে মালা দিলাম। বেলুদি বিন্ধ্যাচল থেকে গাছের ফুল এনেছিলেন, তাই দেখে মা বল্লেন, "বাঃ বেশ সুন্দর, একেবারে খোলা ফুল।" মায়ের শরীর খারাপ থাকাতে মা শুয়ে মুখে মিশ্রী নিলেন। মাথাটা একটু উপরে উঠালেন, আমি জল খাওয়ালাম।

আমি—"মা, আজ লক্ষ্মীপূজা।"

মা—"বেশ ভাল।"

আমার সঙ্গে গুণীতাকে দেখে মা বল্লেন, "তুমিও তো উপাস করেছ?" আমি বল্লাম, "হ্যাঁ।" মা আমাকে ফুল মালা দিলেন। আমি মাকে সত্যনারায়ণের প্রসাদ একটু দিলাম।

পরদিন সকালে মা আমাকে বল্লেন, "কিছু খেয়েছিস্?" আমি না বলাতে মা বল্লেন, "কিছু খাস্ নাই? তাহলে কি দোকানে শিব রয়েছেন? তাঁর পূজা হয় নাই? তুমি দুধ দিয়ে অভিষেক করে পূজা কর, ক্ষমা প্রার্থনা করো।"

শিবকে পূজা করে মায়ের কাছে নিয়ে গেলাম। মা শিবকে মাথায়

ও বুকে স্পর্শ করলেন। একটা মালা দিয়ে মা বল্লেন, "এই মালাটা কেউ রেখে গিয়েছে, বোধহয় শিবের জন্যই ছিল।"

মার কাছে নরেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী বসেছিলেন, তাঁকে দেখিয়ে মা বল্লেন, "বেশ বাবা, মধু পিঙ্গলবর্ণ শিব। এই শিব কুরুক্ষেত্রে যাবে।" কুরুক্ষেত্রে শিবরাত্রি উৎসব হওয়ার কথা। আমি পূজার পর সমস্ত জিনিষ মাকে দিলাম। মা বল্লেন, "তুমি রেখে দাও, পূজারীর কাছে তো জিনিষ থাকে। আমি চাইলে দেবে। পৈতা তো তোমাদের লাগে। টাকাটা রেখে দাও পূজার টাকার সাথে। এখন গিয়ে তুমি খাও।"

১৯৭৭ সনের ৩রা মার্চ

মা লক্ষ্মৌ থেকে সকাল ৭টায় এখানে এলেন। ঠিক সেই সময় মেয়েরা অন্নপূর্ণায় বেদপাঠ করছিল।

মা চণ্ডীমণ্ডপে বসেছিলেন। নারায়ণ স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কেমন আছ?"

উনি বল্লেন, "ভাল আছি"। নারায়ণ স্বামীজী মাকে বল্লেন, "মায়ের মুখ তো ফোলা।"

মা—"এখন আর কি দেখছ? কাল খুব ফোলা ছিল।" মা যমুনাদি ও অভয়দার কথা জিজ্ঞাসা করলেন।

সকলের শারীরিক কুশল সংবাদ নিয়ে মা শোভনাদির বাড়ীতে চলে গেলেন। সেখানে গৃহপ্রবেশ হবে। মা মোটরে গেলেন। আমরা কয়েকজন জিনিষপত্র নিয়ে পৌঁছলাম। মা আমার হাত ধরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ভাস্করদার জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

পানুদা বললেন—"মা, আর সময় নাই, সময় চলে যাচ্ছে।"

মা আমাকে বললেন, "তুই মালা ছিঁড়ে ফেল।" মায়ের কথাতে আমিই মালা ছিঁড়লাম। প্রথমে নারায়ণ প্রবেশ করলেন। তারপর মা আমার হাত ধরে প্রবেশ করলেন। মা ঘরে বসলেন। ভোলাদাকে

সঙ্কল্প করতে বললেন। স্বামীজীকে আনবার জন্য মোটর পাঠালেন।

স্বামীজী এলেন। মা তাঁকে বললেন, "আমি জয়াকে দিয়েই করালাম, ভাস্কর ছিল না।"

সতীদি বললেন, "মা, বাবা এই ঘরে ১২ বৎসর ছিলেন। আমরা এই বাড়ীর প্রথম এবং শেষ ভাড়াটে।"

মা উঠে ঘুরে ঘুরে সব দেখলেন। বাড়ীটা অন্ধকার ছিল। সতীদি বললেন, "আমার জামাইবাবুও উপরে মারা গেছেন।" সঙ্কল্পের পর মা চলে এলেন। মার মোটরে আমি ছিলাম।

বিকেল বেলা মা নারায়ণ স্বামীজীর সঙ্গে গীতা ভারতীর বিষয়ে কথা বলছিলেন।

মা—"বহুদিন আগে গীতা ভারতীর সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল। ওর ভাষণ শুনেছিলাম, উচ্চাসনে বসে বেশ বলছিল। ওর ইচ্ছা ছিল এ শরীরকে দিয়ে মূর্তি প্রতিষ্ঠা করান। আমি বললাম—"এ শরীর তো মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে না।" গীতা ভারতী বলল—"তুমি যা করবে তাই হবে।" আমি ভাস্কর ও নির্বাণকে বসিয়ে মূর্তি স্পর্শ করলাম। ভুবনেশ্বরীর কাছে এ শরীরকে বসিয়েছিল। এ শরীর নারায়ণ এবং শিবকে যা করেছে ভুবনেশ্বরীকেও তাই করেছে। খুব বড় বড় মূর্ত্তি করেছিল। নারায়ণ, দুর্গা, শিব এদের মূর্তি ঘরে ছিল আর গণেশ ও সূর্য্য বাইরে বারান্দায় ছিল। বড় বড় ড্রাম ভরা পয়সা রাখা ছিল। প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা জমিয়েছিল। এক একজন সাধুকে এক একজন দেবতার কাছে বসিয়েছিল।

গীতা ভারতী বলল—"মা আমি এক বছর ফলাহারী হয়ে আছি।" যখন গীতা ভারতীকে নির্বাণী আখড়ায় নিয়েছে তখন অটল সম্প্রদায় আলাদা করে দিল।" মা অনেকক্ষণ গীতা ভারতীর সম্বন্ধে কথা বললেন। রাত্রে আবার কানিয়া ভাইএর সাথে অনেক কথা বললেন।

মামার বাড়ীর উপরে (গোপাল মন্দিরের উপর তলায়) গৃহ প্রবেশ হল। মা বললেন, "বেশ সুন্দর ঘর হয়েছে। ইট্‌গুলো বেশ সুন্দর সাজান হয়েছে।" আমরা শঙ্খ কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়ে বেদপাঠ করলাম। আমি মাকে মালা দিলাম।

আমার ধুনুচী ভাঙ্গা ছিল দেখে মা খুব অসন্তুষ্ট হলেন।

মা—"এই ভাঙ্গা ধুনুচী এনেছিস্, বদলাতে পারিস না?"

আমি—"হ্যাঁ মা, বদলাব।"

মা—"চুপ কর, আবার কথা বলে, বুকি।" আরও কিছুক্ষণ তিরস্কার করলেন। আমাদের সকলকে প্রসাদ দিলেন। মেয়েরা কীর্তন করে নাই, তাই মা বললেন, "একটু কীর্তনও করল না। এই শরীর তো ভিখারী।"

১৯৭৭ সনের ৪ই মার্চ

আজ দোল উৎসব। মা গীতাকে দোল্‌নাতে ঠাকুর বসাতে বল্লেন। সন্ধ্যায় আমাদের উঠানে নারায়ণ পূজা হল। অধিবাস হল, মা এসে যজ্ঞ-মন্দিরের বারান্দায় বসলেন। পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে, কীর্তন হচ্ছে, মা বসে আছেন—অপূর্ব শোভা হয়েছিল। পূজার পর বাগানে বুড়ীর ঘর পোড়ংন হল। মা দাঁড়িয়েছিলেন।

মা—"ওরা তো এসব নিয়েই থাকে। এসব একটু করুক্, আপদ বালাই যাক্, শত্রু ক্ষয় হোক্, অমৃতের সন্তান—সব বিপদ দূর হোক্" ইত্যাদি।

পূজার পর মা দোতালার ঘরে ছিলেন। রাত্রে কান্তিজী মঞ্চের চারিধার পরিষ্কার কর্‌ছিলেন। তাই দেখে মা বাণীদিকে বল্লেন, "এই নোংরার মধ্যে পূজা হবে, এরকম জানলে আমি আসতাম না।" মা নিজে দাঁড়িয়ে পরিষ্কার করালেন। তারপর বেদীতে আবীর দিতে বল্লেন।

মা—"মেয়েরা কে আছে? সকলে কি ঘুমিয়ে পড়েছে? আমি মার কাছে গেলাম। মা গঙ্গাজল দিয়ে সমস্ত উঠান ধোয়ালেন। বল্লেন, "জয়া, আবীর নিয়ে আয়, আলপনা দে।" আমি তুলসীদিকে পাঠালাম। তুলসীদিকে মা বল্লেন, "ফ্যাসান করিস্ না। এরকম করে দে।" মা নিজ হাতে আলপনা দেওয়া শিখিয়ে দিলেন। অধিবাসের পর সব কাজ করে মা মামার বাড়ী শুতে গেলেন। আমি মার কাছে গেলাম।

মা—"তুমি উপবাস করেছ?"

আমি—"মা, অনেকক্ষণ উপবাস ছিলাম, তারপর না পেরে খেয়ে নিয়েছি।"

মা—"ভাল করেছো, এখন খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়।"

আমি—"মা, এখন তো অনেক কাজ, গোপাল মন্দিরে সব জোগাড় না করলে কাল করতে পারব না।"

মা—"মেয়েদের নিয়ে কর।"

আমি—"মা, প্রতিবৎসর এরকম হবে?"

মা—"করতে পারলে করিস্।"

মায়ের আদেশানুসারে এখনও প্রতি বৎসর দোল-পূর্ণিমাতে নারায়ণের অধিবাস হয়।

পূজার সময় মা আমাকে "কুটী" বলে ডাকছিলেন। নূতন নাম দিলেন।

পরদিন পৌনে ৬টায় মা আমাদের উঠানে এসে বসলেন। ৬টায় নারায়ণ পূজা শুরু হল। ভোলাদা পূজা করলেন। মা পূজাতে বসেছিলেন। সকলে মায়ের চরণে আবীর দিচ্ছিল। পূজার পর মা আমাদের আবীর দিতে বল্লেন, মেয়েরা নারায়ণকে আবীর দিল। মা আমাকে এবং গীতাকে আবীর দিলেন। আমার গায়ে, মাথায়,

চশমার ফাঁক দিয়ে চোখে, মুখে, সব জায়গায় আবীর দিলেন। নারায়ণ স্বামীজীর কথায় আমাকে আর গীতাকে নিয়ে ফটো ওঠালেন। তারপর সব ঠাকুরদের আবীর দিলেন। নারায়ণকে দোলালেন। ইন্দিরাজীর গোপালের ফটোতে মা আবীর দিলেন। তারপর মা গোপালকে আবীর দিলেন। মেয়েরাও সকলে গোপালকে আবীর দিলেন। গোপালকে স্পর্শ করতে নিষেধ করলেন।

মা দীক্ষার জন্য মণ্ডপে এলেন। মণ্ডপ থেকে মা আবার গোপাল মন্দিরে পূজায় বসলেন। আমি গোপাল মন্দিরে মাকে জল খাওয়ালাম। মা আমাকে ডেকে আবার আবীর দিলেন। মাথায় হাত দিয়ে মা বল্লেন, "কি পরিশ্রম হচ্ছে।" সচ্চিদানন্দজী এবং নারায়ণ স্বামীজীকে আবীর দিতে বল্লেন। গোপাল মন্দির থেকে আমাদের উঠানে এলেন। দরিদ্রনারায়ণ ভোজন হল। তারপর আবার পিচ্কারী দিয়ে খেললেন। আমাকে মা ঘটী দিয়ে রঙ্ দিলেন। পিচকারী দিয়ে সকলকে রঙ্ দিয়ে গোপাল মন্দিরে গেলেন।

সন্ধ্যায় সত্যনারায়ণ পূজা হল। বেদীতে মার ফটো ছিল। বেদীতে নারায়ণ বসাই নাই. তাই মা অসন্তুষ্ট হলেন।

মা—"নারায়ণকে বেদীতে কেন বসাস্ নাই? কোন বুদ্ধি নাই?"

আমি মাকে মালা পরিয়ে হাতে নাড়ু দিলাম। পূজার পর আরতি হল। মা আরতিতে বসেছিলেন। আরতির পর মা সিন্নি মাখতে বল্লেন। মা বল্লেন, "কাউকে সঙ্গে নে।" মা আমাকে মালা দিয়ে চণ্ডীমণ্ডপে বসলেন। সকলকে প্রসাদ দিতে বল্লেন। মা খুব ভাল ভাল কথা বললেন—"মাটিতে বীজ দিলে যেমন গাছ হয়, দীক্ষাও সেরকম বীজ", ইত্যাদি।

মা কিছুক্ষণ কথা বলে মামার বাড়ী গেলেন।

মা—"আমাকে কেউ সত্যনারায়ণের প্রসাদ দিল না।" পুষ্পদি তাড়াতাড়ি প্রসাদ নিয়ে গেলেন। আমি মিষ্টি নিয়ে গেলাম। মা

বললেন, "দেখেছি।" আমি খাই নাই শুনে মা বললেন, "এখনও খাস্ নাই? এই মেয়েটা উপাস্ করে কত কাজ করে, আবার আমি বকি! দেখিস্, সিঁড়ি দেখে চলিস্।"

সত্যনারায়ণ পূজার সময় বললেন—"উপাস করে খুব সামলাচ্ছ।"

পরদিন সকালে মা আবার গীতা ভারতীর উৎসবের কথা বলেছিলেন। মা বল্লেন, "সকলে সেটাকে মহাকুম্ভ—অভিনব কুম্ভ বলেছে। গোবিন্দ প্রকাশজী অভিনব কুম্ভ বলেছেন। গীতা ভারতী সব জায়গায় ভাষণ দিয়ে ৯ বছর ধরে পরিশ্রম করে এই উৎসব করেছে।"

৩০শে মার্চ

মা সকাল ৯টায় দেওঘর থেকে এখানে এলেন। এখানে বাসন্তী পূজা চলছিল। সেদিন বিজয়া দশমী। মা এসেই মণ্ডপে প্রবেশ করলেন। তখন দেবীর ভোগ হল। মায়ের পূজা হল, ভোগের পর আরতি হল। মা ফটো ওঠাতে বললেন। আরতির পর বিসর্জন হল। মা মেয়েদের এবং ছেলেদের নিয়ে ফটো উঠালেন। মা চিত্রাদি, পুষ্পদি, গঙ্গাদি সকলকে ডেকে পাঠালেন। গঙ্গাদিকে বললেন, "তোমাদের ডাকতে হয়, তোমরা নিজেরা আসতে পার না।" ফটো উঠাবার পর শান্তিজল দেওয়া হল। মা সকলকে কমলালেবু এবং বাতাসা দিলেন। মা আমাকে বললেন—"দই-খই দিস্ নাই? দই-এর উপর খই দিতে হয়।"

তুলসীদি মার রান্না করেছিল। মা খেতে বসে বললেন, "সব রান্না ভাল হয়েছে, কোন্‌টা ফেলে কোন্‌টা খাই।" মা রান্নার খুব প্রশংসা করলেন। রাত্রে বিসর্জনের পর মা বাতাসা দিলেন।

১৯৭৭ সনের ১লা মে

আমরা ৩০ তারিখে মার জন্মোৎসবে দেরাদুন গেলাম। আমরা

কনখলে নেমে দিদিমাকে প্রণাম করে দেরাদুন রওনা হলাম। আমরা প্রায় ৪০ জন ছিলাম। দেরাদুনে রামতীর্থ আশ্রমে সন্ধ্যায় পৌঁছালাম। খুব সুন্দর জায়গা, চারদিকে পাহাড়। মাকে প্রণাম করলাম।

মা বললেন, "তোমাদের তো এখন পরীক্ষা।"

আমি—"মা, পরীক্ষা ৭ তারিখে শুরু। আমি সেই দিনেই রওনা হব।"

গিরিবালাদির পরলোক গমনের বিষয়ে বলাতে মা বললেন—"আমি জানি।"

২ তারিখে সারাদিন উপোস করে সারারাত জেগে পূজার জোগাড় করলাম। রাত্রে চণ্ডীর ঘটের সামনে পূজা হল। নির্বাণদা পূজা করলেন। নির্বাণদা ৫টায় আরতি করলেন। প্রায় ১০টার সময় কাজ সেরে মাকে প্রণাম করতে গেলাম।

মা বললেন, "এদের কেন ঢুকিয়েছিস?"

মৈত্রেয়জী—"মা, এ তো জয়া, কাল থেকে উপাস, একটু ফুল দিয়ে চলে যাবে।"

মা শুনে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "এখনও উপাস, কিছু খাস নাই? যা যা, খা গিয়ে।" এই বলে মা মাথায় ও পিঠে হাত দিলেন।

রাত্রে মা বললেন, "সৎসঙ্গ কর। এরা সব দিতে চায়, নেওয়ার কেউ নেই। ঘুম তো রোজই আছে। তোমরা সকলে আসবে। এ শরীরকে সময় মত নিয়ে গেছে সৎসঙ্গে। আজকে গিয়ে দেখি সব খালি। একটু সৎসঙ্গ কর।"

মায়ের শরীর ভাল ছিল না। মাকে রাজাবেন পূজা করলেন। মা আমাকে ফল দিতে বললেন।

সকালে মা রাসলীলাতে আসতেন। দুপুরে ৩টা থেকে ৬টা পর্যন্ত সৎসঙ্গ হত। ৩ দিন অখণ্ড রামায়ণ পাঠ হল। শতচণ্ডী হল। ১০৮ কুমারী ভোজন হল। মাকে খুব সুন্দর করে রূপার গহনা দিয়ে সাজান হয়েছিল।

প্রত্যেক কুমারীকে কাপড়, টাকা ও একটা রূপার আংটি দেওয়া হয়েছিল। মা সব কুমারীদের মাথায় ফুল দিলেন। একজন কুমারীর কাপড় মার পায়ে লেগেছিল, সেই কাপড় মা নিজের মাথায় লাগালেন। মা আমাদের এভাবে শিক্ষা দিলেন। শতচণ্ডী পূর্ণ হলে যজ্ঞ হল। মা পূর্ণাহুতির সময় এসেছিলেন। মা আমাকে বললেন, "সকলের জন্য যজ্ঞের ফোঁটা নিয়ে যাও।"

সারারাত মায়ের পূজার জোগাড় করলাম। ৩টার সময় রূপার সিংহাসনে মা এলেন। মেয়েরা শঙ্খ বাজাল। বেদপাঠ করল। মায়ের পূজা শুরু হল। তন্ময়দা, বিভুদা, পুষ্পদি, ছবিদি কীর্তন করলেন। মহন্তদের আরতি হল। পূজার পর সকলে অঞ্জলি দিলেন।

মায়ের সমাধি প্রায় ১২টা-১টায় ভাঙ্গল। আমি কাশী চলে আসব বলে মাকে প্রণাম করতে গেলাম। মা আমাকে দিয়ে চিঠি লেখালেন।

মা—"পিসিমাকে নিয়ে যাস্, সুখধামে গিরিবালাদির জায়গায় রাখিস্।"

মা রুমাল দিলেন। মাকে প্রণাম করে কাশী রওনা হলাম।

১৯৭৭ সনের ২৫শে অক্টোবর

মা সন্ধ্যায় কনখল থেকে এলেন। এসেই মা গোপাল মন্দিরে প্রবেশ করে আদরের গোপালকে দর্শন করলেন। তারপর আমাদের উঠানে বসলেন। সকলের শারীরিক কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করলেন। ছবিদির সঙ্গে কথা বললেন। মেয়েদের জন্য মা শোয়েটার দিলেন।

আমাকে বললেন, "কোথায় রাখ? বাক্সে রাখবে। তুমি আর গীতা মিলে রেখো। তোমাদের গায়ে লাগলে তোমরাও পরবে।"

এবার আমাদের এখানে লক্ষ্মীপূজা, তাই মা বললেন, "প্রদোষ কখন?"

আমি—"বোধহয় ৬টা হবে।"

মা –"৫টার মধ্যে সব জোগাড় করবে। শুধু প্রদীপ জ্বালান বাকী থাকবে। নির্মল পূজা করবে তো, সব ঠিক করে রেখো।"

মা আমাকে প্রদীপ দিলেন। নির্মলদা পূজা করলেন। নারায়ণ স্বামীজী পূজা করালেন। মেয়েরা সারাদিন ধরে পূজার জোগাড় করল। লক্ষ্মী প্রতিমা খুব সুন্দর হয়েছিল। ভোগের পর মায়ের পূজা হল। তারপর অন্যান্য ভক্তরা মায়ের পূজা করল। মেয়েরা ঠাকুর ঘরে মায়ের পূজার জোগাড় করেছিল, কিন্তু মা শারীরিক অসুস্থতার জন্য যেতে পারেন নাই।

মা—"জয়া কোথায়? আমাকে কখন যেতে হবে?" আমি মাকে ডাকলাম।

মা—"একটু আগে তো বলতে পারতে।"

মাকে আমি পূজা করব সেই খবর মাকে দেই নাই। মা মণ্ডপে এসে বসলেন।

মা—"কতক্ষণ বসতে হবে?"

আমি—"বেশীক্ষণ না।" মার চরণ ধুয়ে মালা পরিয়ে একটু খাওয়ালাম।

মা –"নির্মলকে সুন্দর করে প্রসাদ পাঠিয়ে দে।" পূজার পর মা প্রতিমাকে দেখলেন।

মা –"খুব সুন্দর হয়েছে।"

ছবিদিকে মা কীর্তন করতে বল্লেন। পুষ্পদিও গান করলেন।

মা খুব ধীরে ধীরে "লক্ষীনারায়ণ" নাম কীর্তন করলেন।

মা—"দই-চিড়া দিস্ নাই, যা আমার দই-চিড়া এনে দে।"

পূজার পর দই চিড়া ভোগ দিতে হয়। আমি দেই নাই, তাই মা পূর্ণ করে দিলেন।

প্রতিদিন রাত্রে আমি মায়ের সঙ্গে দেখা করতেযাই।

মা—"জলের জন্য বসে আছি।"

আমি জল খাওয়ালাম।

পরদিন মা লক্ষ্মীর পূজার পর বিসর্জন হল। মা আমাদের সকলকে ডেকে প্রসাদ দিলেন। আমাকে ডাকলেন। মা আমাকে সিঁদূর কৌটা দিয়েছিলেন, সেটা মাকে দিলাম। পূজার বস্ত্রও মাকে দিলাম। মা রাজগীরে অজ্ঞাতবাসে গেলেন। মা কিছুই খাবেন না শুনে সকলে মার কাছে আমাকে পাঠাল।

আমি—"মা, তুমি কিছু খেয়ে যাও।"

মা—"এখন খেলে পরে আর খেতে পারব না। যা সকালে খাই, তাই খেয়ে যাব।"

রাজগীরে রওনা হবার সময় বিভূদাকে বল্লেন, "বেশী করে দুধ খাবে, ভাল হয়ে থাকবে।" কান্তিজীকে জিনিষ দিয়ে মা বল্লেন, "এই শরীর আবার এলে এই জিনিষ দিও।" সকলকে বল্লেন, "যদি তোমরা শরীর ঠিক রাখ, তাহলে কালীপূজায় আসা হবে।"

৮ই নভেম্বর

মা রাত্রি সাড়ে ৯টায় রাজগীর থেকে এলেন। এসেই গোপাল মন্দিরে গেলেন। তারপর চণ্ডীমণ্ডপের বারান্দায় বসলেন। সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। আমাদের বল্লেন, "তোমরা ভাল আছ তো?"

বিভূদাকে বললেন,—"কেমন আছ?"

মা অন্যান্য ভক্তদের কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করলেন। তারপর মামার বাড়ী গেলেন।

মায়ের আদেশে আমি বাড়ী গিয়েছিলাম।

আমি—"মা, বাবা ভাল আছেন, প্রণাম জানিয়েছেন।"

মা—"ভাল। বাবাকে দেখে এসেছ, ভাল করেছ।" মা অনেক টুকরী এনেছিলেন। তাতে তরকারী ও ফল ছিল।

মা মন্দিরে ভোগ দিতে বল্লেন এবং কিছু মা কালীর ভোগের জন্য রাখলেন।

৯ তারিখে মা আমাদের বদ্রীনারায়ণের প্রসাদ দিলেন। সন্ধ্যায় মা ডেকে বল্লেন, "সোনামুগ ডাল এসেছে, তোমরা ভেজেছ? আজই ভেজে রাখনি কেন?"

আমি—"মা, সকালে মেয়েদের নিয়ে বাণীদি ভাজিয়ে নেবে।"

মা—"অন্নপূর্ণায় কে করবে?"

আমি—"মা, উষাদি করবে। ঠাকুর এসেছেন বরণ করব?"

মা—"হ্যাঁ, তোমরা বরণ কর গিয়ে।"

মা—"তোমাদের জিনিষ সকলকে দেওয়া হয়ে গেছে?"

মা আমাদের অনেক জিনিষ দিয়েছিলেন সকলকে দিতে বলেছিলেন।

আমি—"কান্তিজী ও গীতা বোধ হয় দিয়ে দিয়েছে। আমি পরে নেব"

রাত্রি ৯টার পর মা আবার ডাকলেন।

মা—"খইএর মোয়া করতে জানিস?"

আমি—"হ্যাঁ মা, দুধ দিয়ে গুড় জ্বাল দিয়ে মোয়া করে দেব।"

খুব ধীরে ধীরে কানের কাছে মুখ নিয়ে মা বললেন, "শোন, একটা হাঁড়ির মধ্যে ঘী দিয়ে তার মধ্যে গুড় খই দিয়ে জ্বাল দিয়ে পরে হাঁড়িটা ভেঙ্গে দিবি। কাউকে বলবি না, প্রাইভেট।"

মা—"তোদের হাঁড়ি আসে না?"

আমি—"গামলা এসেছে।"

মা—"ও দিয়ে কি করবি?"

আমি—"চাটনী ডাল থাকবে।"

মা—"আচ্ছা।"

মামার বাড়ী যাওয়ার সময় মা প্রতিমা দেখলেন।

মা—"প্রতিমা খুব সুন্দর হয়েছে, ছবি আছে তো? বেশ সাজান হয়েছে।"

রাত্রে আমি প্রণাম করতে গেলাম।

মা—"মোয়া করে দিস্, ওসব হ্যাঙ্গাম করিস্ না।"

আমি—"যতটা ধান আছে সব করব?"

মা—"যতটা পারিস্, দুই দিনের জন্য আনিয়েছি।"

আমি—"আচ্ছা, যতটা পারি করব।"

১০ই নভেম্বর

আজ কালী পূজা। সকাল থেকে পূজার জোগাড় করলাম। দুপুরে মোয়া বানিয়ে মাকে দেখালাম। মা খুব খুসী হলেন। মা বললেন, "বেশ সুন্দর হয়েছে।"

আমি—"মা, প্রায় সব খই করে ফেলেছি।"

মা—"বাঃ, খুব ভাল।"

রাত্রে পূজা শুরু হল। মা ১১টায় মণ্ডপে এলেন। নির্বাণদা পূজা শুরু করলেন। তারপর বিভূতিবাবু ও তাঁর স্ত্রী মায়ের পূজা করলেন। মাকে সোনার মুকুট ও নূপুর দিলেন।

কিছুক্ষণ বসে মা বললেন, "একটু গড়িয়ে আসি।"

মা মণ্ডপ থেকে বাইরে উঠানে এসে বসলেন।

একে তো মধ্যরাত্রি, গঙ্গার কল কল ধ্বনি, কীর্তন চলছিল। তখনকার অপূর্ব শোভা বর্ণনা করা লেখনীর দ্বারা সম্ভব নয়।

মা ভোগের সময় মণ্ডপে এলেন। সেই সময় কুমারী পূজা হচ্ছিল, মা কুমারীকে একটু হাসতে বললেন।

পূজার পর মা নির্বাণদার জন্য একটা থালা প্রসাদ পাঠাতে বললেন। উপবাসীদের জন্য ২ থালা প্রসাদ এবং বিভূতিবাবুর জন্য প্রসাদ দিতে বললেন। পানুদার কাছেও প্রসাদ পাঠাতে বললেন।

মা খুব জোরে জোরে "জয়া জয়া" বলে ডাকলেন।

মা—"তুমি নির্বাণের খাবারটা পৌঁছাবার ব্যবস্থা করো। কে পৌঁছাবে ?"

আমি—"মা, কান্তিজী নিয়ে যাবেন।"

মা বলি বৈশ্য করতে বল্‌লেন।

পূজার পর মা ফটো ওঠালেন।

মা সরবৎ ও মুসুম্বীর রসও করতে বললেন। সব কাজ করে গিয়ে দেখি মা মণ্ডপে বসে আছেন। মা আমাকে ফটো ওঠাতে বললেন, আমি, শিখা, সুচেতা ফটো উঠালাম। মা গীতাকে ডাকলেন। শিখা মা কালীকে পিছন দিয়ে দাঁড়াল। মা নিষেধ করলেন। মা নিজে সব ফল মিষ্টি আমাদের দিলেন। মা সব জিনিষ গোছালেন। পরে আমাদের খেতে পাঠালেন।

তারপর দিন মা অতিথিদের ফল মিষ্টি দিতে বললেন। পরের দিন অন্নকূট।

আমি—"মা, আমি রান্না করছি।"

মা—"তুই রান্না করছিস্ ?"

আমি—"ছোট ছোট রান্না করছি।"

মা আমাকে বরণ করতে বললেন।

সন্ধ্যায় মার কাছে গিয়েছি।

মা—"নারায়ণ স্বামীজী খুব প্রশংসা করেছে। সব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে করেছে।"

রান্না করছি একথা মাকে বলে এসে প্রায় ৪০—৫০ পদ রান্না করলাম। কাশীতে অন্নপূর্ণা মন্দিরে অন্নকূট উৎসব হয়। সওয়া মন চাউলের অন্নভোগ হয় এবং ফল ও মিষ্টি দিয়ে ১০৮ পদ ভোগ হয়। অন্নপূর্ণা মন্দিরে অন্নভোগ সাজান হল। মা স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। অন্নের উপর দিয়ে মা ছবিদিকে রাধাকৃষ্ণ সাজাতে বললেন। মা নিজে দাঁড়িয়ে

শিখিয়ে দিলেন। সুন্দর করে ভোগ সাজিয়ে অন্নপূর্ণা মায়ের ভোগ হল। খুব কীর্ত্তন হচ্ছিল, বহুলোকের ভীড়, আশ্রমে একটুও স্থান ছিল না। মায়েরও বিশেষ ভোগ হল।

প্রতিবৎসরই মায়ের নির্দেশে অন্নকূট উৎসব হয়।

পরের দিন মা পটলদার বাড়ী প্রসাদ পাঠাতে বললেন।

মা—"পটলের থালায় তোর খইএর কলসীটা থাকলে দিস্। সুন্দর করে সাজাস্। পারলে দেখাস্। ওদের হাতে দিও না।"

সেদিন দাদাভাই ভাইফোঁটা দিলেন। মা ব্রহ্মবিন্দু বলতেন। মা সব মেয়েদের ফোঁটা দিতে বললেন। অনেক মেয়ে ঘুমিয়ে ছিল, দাদাভাই অসন্তুষ্ট হলেন।

মা বললেন—"ঘুমাতে দাও, দিদি।"

মামার বাড়ী যাওয়ার সময় মা দাদাভাইকে বললেন, "এই নাও দিদি।" এই বলে মা মালা দিলেন। বিশুদ্ধাদিকে মালা দিয়ে মা বললেন, "অনেক করে বেঁচে উঠেছে।"

ছবিদি—"মা, জয়া পায় নি।"

মা আমাকেও, কান্তিজীকে মালা দিলেন।

কান্তানন্দকে চাদর দিলেন, ছবিদিকে মালা দিলেন।

মার হাতে জরির মালা ছিল দেখে আমি বললাম, "বেশ সুন্দর মালা, ঠাকুরঘরে দেওয়া যেতে পারে।"

মা—"এই নাও ঠাকুরের জন্য।"

এই বলে মালা দিয়ে মা মামার বাড়ী গেলেন।

রাত্রে আমি মার কাছে গেলাম।

মা বললেন—"তুই এখানে আবার এসেছিস্? তোর পরিশ্রম হয় না? বাবা! কি কাজ করে! রাত জাগা, উপবাস করা, এই মোটা শরীর নিয়ে হাসিমুখে সব করে।"

মা খুব প্রশংসা করলেন।

১৯৭৮ সনের ৬ই জানুয়ারী

মায়ের কাছে অনেকেই প্রশ্ন করে।

জনৈক ভক্ত—"মা, মন কি করে শান্ত হবে ?"

মা – "ভগবানের নাম কর।"

ভক্ত—"কি নাম করব ?"

মা—"তোমার যা ভাল লাগে।"

ভক্ত—"মা, আমি তো জানি না, আমি তো সকলকেই ডাকি।

মা—"রাত্রে চিন্তা করে শোবে, সকালে উঠে যাকে মনে হবে তাকেই ডাকবে, নমস্কার করবে।"

সন্ধ্যায় একটা ছোট মেয়েকে মা বললেন, "ভগবানের নাম কর। কালী কালী, দুর্গা দুর্গা, শিব শিব, রাম রাম" ইত্যাদি। একবার মা বললেন, সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটিও বলল। মেয়েটির বাবাও সঙ্গে ছিলেন।

মা—"তোমার কি খেতে ভাল লাগে ?"

মেয়েটি কিছু বলছে না। মেয়েটার বাবা বললেন, "মা, ও মৌন হয়ে আছে।"

মা—"আমার বন্ধু তো ? বন্ধু, বন্ধুর কথা শুনবে না। আমি যাদের বিয়ে হয় নাই তাদের বন্ধু বলি, বিয়ে হলে মা বলি।"

রাত্রে মাকে খাওয়ালাম। মা বহু ভক্তের সঙ্গে কথা বললেন।

মা দাদাভাইকে রাত্রে কথাপ্রসঙ্গে নিজের শরীরের কথা বলছিলেন, —"কলিযুগে অন্নগত প্রাণ। অন্ন বন্ধ হবে বলে কোনদিন ৩টা ভাত খেতাম, কোন সময় এক চিমটিতে যা ধরবে তাই খেতাম। কোন সময়ে এক নিঃশ্বাসে যা উঠবে তাই। (দাদাভাইকে দেখিয়ে) এই তো, দিদি তো ছিল, সব জানে।"

দাদাভাই—"আমি তো খাইয়েছি, ৩টা ভাত। মাটিতেও ভাত খাইয়েছি। কোন রকমে চলত।"

মা—"শরীরটা যেখানে সেখানে পড়ে থাকত। মাটিতে ঘাসের ওপর

পড়ে আছে, উপর থেকে রোদ পড়ছে। সর্দি কাশি কিছু হত না। যখন নিয়ম মত খাওয়া দাওয়া শুরু করেছি, তখন এসব হবেই। (নিজের শরীর দেখিয়ে) এই যে সব দেখছ কোন খেয়াল থাকত না। কোন সময় গরম তাওয়া ধরে হাত পোড়াতাম, ভাইজীর সঙ্গে পায়ে হেঁটে উত্তর কাশী পৌঁছালাম। মাঝখানে বড়োলিয়া নামে এক জায়গায় থেমে-ছিলাম। তিন দিনে পৌঁছিয়েছি। চটি পরতাম না। প্রথম দিনে চটি দূরে কোথায় চলে গেল। সকলে বলল অভ্যাস করলে ঠিক হবে। জুতা পরতে পরতে পায়ে ঘা হয়ে গেল, তখন এক ব্যাপার। ডাক্তার অনেক ঔষধ দিল। তখন তো অনেক কাজ করতাম, কাজ করতে করতে হাতে ছাল ফুটিয়েছি। হাত লাল হয়ে যেত, আঙ্গুলে ছাল ফুটে গেছে, চাকু দিয়ে কেটে কেটে ছাল বার করেছি। রক্ত পড়ছে, খেয়াল নেই। জুতা পরতে পরতে পা নীল হয়ে গেল। ভাইজীকে বললাম—ভাইজী বলল, 'পরতে পরতে ঠিক হয়ে যাবে'। একদিন আমি নিজে এক পায়ে জুতা পরেছি, আর এক পায়ে জুতা পরতে গিয়ে দেখি যে পা নীল হয়ে ফুলে আছে। দেখে বলল, 'তোমরা বলো নি কেন?' আমি বললাম—তোমরা বলেছ পরতে পরতে ঠিক হবে, তাই আমি বলি নাই। এক এক দিন লু-এর মধ্যে খালি পায়ে চলে যেতাম। একবার পাটকাঠি জ্বালিয়ে তার মধ্যে একটা চাল পুড়িয়ে মুখে ছোওয়ান হত যাতে অন্ন বন্ধ না হয়ে যায়।"

১৯৭৮ সনের ১৮ই মে

আমরা জন্মোৎসবে কনখলে মার দর্শনে গেলাম। মা দেখেই জিজ্ঞাসা করলেন, "গুণীতা আসে নাই?"

আমি বললাম—"ও লেখা শেষ করছে।"

আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন ইতিমধ্যে নির্মলদা মার সঙ্গে কথা বলতে এলেন।

নির্মলদা—"মা, আজ বিকালে সৎসঙ্গে যেতে হবে।"

মা—"আমি ৫টার পর যাব।"

মা আমাকে বললেন, "তোমার দায়িত্ব, পূর্ণানন্দ আশ্রমে কীর্তনের জন্য ছবিকে বলে এস।" সেই সময় কনখলে ভাগবত সপ্তাহ হচ্ছিল। মা লতুদির ভাগবতে একটু বসলেন। তাঁরা মার পূজা করলেন।

বাসন্তীদির ভাগবতে বসলেন। তাঁরাও মায়ের পূজা করলেন। তাঁরা অনেক জিনিষ দিলেন।

মা—"আর কত দেবে।"

বাসন্তীদি—"মা, কি আর দেব। তোমারই ত জিনিষ।"

বাসন্তীদি কোন কথা মাকে বলাতে মা বললেন—"ওসব কথায় কিছু মনে করতে নেই।" তারপর হলে মা কুমারী পূজাতে বসলেন। মাকে শাড়ী পরান হল। মা আমাকে ডেকে বললেন, "আমার ঘরে ছানার সন্দেশ আছে, ওকে (কোন অতিথিকে) দিতে বল।"

সন্ধ্যায় মা ভাগবত পাঠে বসেছিলেন। শ্রীনারায়ণ গোস্বামীজী সুললিত ভাষায় বাংলায় ব্যাখ্যা করছিলেন।

সৎসঙ্গে বসে মা আমাকে বললেন, "তুই পরমানন্দকে বলে আয়, গাড়ী এখানে ঠিক করে রাখতে। আরতি হয়ে গেলেই আমি রওনা হব।" আরতির পর মা পূর্ণানন্দ আশ্রমে রওনা হলেন। আমরাও মার সঙ্গে রওনা হলাম।

মা যখন আশ্রমে পৌঁছালেন, তখন পূর্ণানন্দ স্বামীজী আশ্রমে ছিলেন না। সেজন্য মা সৎসঙ্গে না বসে যেখানে লোকেরা বসে সেখানে বসলেন। কিছুক্ষণ পর পূর্ণানন্দ স্বামীজী এলেন। এসেই মাকে মালা দিলেন।

প্রত্যেক সাধুকে মা সম্মান করতেন, আমরা দেখেছি। কোন সাধু মার কাছে এলেই মা তাঁকে মালা দিতে বলতেন। তাই নির্মলদাও

স্বামীজীকে মালা দিলেন। স্বামীজী মাকে নিয়ে সৎসঙ্গ হলে বসালেন। সব সাধুরা উদ্‌ঘাটন ভাষণ দিলেন।

স্বামীজী বল্লেন, "আমাদের অনেক ভাগ্য যে মা দয়া করে এখানে এসেছেন।"

সৎসঙ্গের পর প্রোগ্রাম ঘোষণা করা হল। মাকেও সৎসঙ্গে কিছু বলবার জন্য অনুরোধ করল। মা ছবিদির দিকে তাকিয়ে হাত দেখিয়ে ইঙ্গিতে বোঝালেন কিছুই বলা হবে না।

ছবিদির গান হয়ে সৎসঙ্গ শেষ হল।

মা আমাকে ডেকে বললেন, "তুমি আর গীতা চন্দনদি ও শান্তাজীর সাথে কাজ করবে। ওদের বলে এস, তোমাদের অসুবিধা হলে আমরা করব।"

১৯শে মে

মা সকালে পূর্ণানন্দ আশ্রমে গেলেন। কিছুক্ষণ সেখানে থেকে আশ্রমে এলেন, কারণ ভাগবত সপ্তাহের পূর্ণাহুতি ছিল। যজ্ঞশালার সামনে যজ্ঞ হল। যজ্ঞের উপর চাঁদোয়া টাঙ্গান হয় নাই বলে মা মৈত্রেয়ী-জীর উপর অসন্তুষ্ট হলেন! যজ্ঞ থেকে এসে মা নীচের ঘরে বিশ্রাম করলেন।

বিশ্রামের পর মা ফল নিয়ে পূর্ণানন্দ আশ্রমে রওনা হলেন। সেখানে সৎসঙ্গ হল। রাত্রে রাসলীলা হল, সন্ধ্যায় আরতি হল।

মা আমাকে আর গীতাকে বল্লেন—"তোমরা এক এক দিন করে শিব মন্দিরে রান্না করবে।"

কনখল আশ্রম থেকে মার কাছে গিয়েছিলাম। শুনলাম গঙ্গার ঘাটে গিয়েছেন। মাকে গাড়ীতে দেখে আশ্রমে ফিরলাম। বিকালে আবার মাকে প্রণাম করতে গিয়েছি।

মা—"তুই কার সাথে এসেছিস্?"

আমি—"নির্মলদার গাড়ীতে।"

কনখল আশ্রম থেকে পূর্ণানন্দজীর আশ্রমে প্রতি দিন যাওয়া আসা করি। ৫টা থেকে ৭টা পর্য্যন্ত সৎসঙ্গ হল'। মার আরতি হল। মেয়েরা রাত্রে মার নাম কীর্তন করল। মা হরে কৃষ্ণ নাম করতে বল্লেন।

তাড়াতাড়ি শিব মন্দিরের ভোগ রান্না করে মার কাছে গেলাম। সেদিন কুমারী পূজা ছিল। সারারাত কীর্তন করে ভোরে মায়ের আরতি দেখে আশ্রমে এসে রান্না করে মাকে প্রণাম করতে গেলাম। মা আমাকে দেখেই একটা ষ্টিলের প্লেটে মিশ্রী ভরে আমাকে দিয়ে বল্লেন, "এইটা নে।" আমার খুব আনন্দ হল।

জনৈক ভক্ত—"মা আমার মেয়ে হাত নাড়াতে পারে না। অনেক ঔষধ করেছি, কোন কাজ হয় না।"

মা—"তুই হাত নাড়া চাড়া করতে বলবে, হাত নাড়াতে নাড়াতে হাঁটবে। দেখ, ভগবান কি করেন?"

মা কুমারী পূজাতে এলেন। মাকে সুন্দর শাড়ী পরিয়ে পূজা করা হল। রাণুদিও মাকে শাড়ী পরিয়ে মাথায় জরির মুকুট পরিয়ে গলায় মালা পরিয়ে পূজা করলেন, আরতি করলেন। মা মুকুটটা রাণুদির মাথায় দিয়ে দিলেন। মা কুমারীদের মাথায় ফুল দিলেন। আমরা কুমারীদের আরতি করলাম। পূজা দেখে আবার আশ্রমে ফিরলাম। বিকালে আবার আশ্রম থেকে মাকে প্রণাম করতে গেলাম।

মা—"কার সাথে এসেছিস্?"

আমি—"ত্রিগুণাদার সাথে।"

মা—"ত্রিগুণাদা ওখানে থাকে, এখানে থাকে না?"

আমি—"না, ওখানে থাকেন।"

মা—"রান্না করতে খুব কষ্ট হয় না? শ্যামাকে কি পাঠাব?"

আমি—"না মা, আমি করে নেব।"

মা—"কোন রকমে চালিয়ে নাও।"

মার সঙ্গে কথা বলে সৎসঙ্গে এলাম। ৭টা পর্য্যন্ত সৎসঙ্গ হল। ৯টার পর মাতৃ সৎসঙ্গ। মায়ের কথা না শুনলে মন ভাল লাগে না। আশ্রমে ফিরতে ইচ্ছা করে না। "ভগবানই সব করেন" এই প্রসঙ্গে মা একটি গল্প বললেন।

পরদিন মাকে প্রণাম করতে গেলাম। গোয়ালিয়রের মহারাণী মার কাছে বসেছিলেন। মা আমাদের দেখিয়ে বললেন, "এরা সব কন্যাপীঠের মেয়ে—আচার্য্য, শাস্ত্রী পাশ।"

গোয়ালিয়রের মহারাণী—"মা, আমি কন্যাপীঠের জন্য ১০০৲ টাকা দেই। আমার ট্রাষ্ট থেকে যায়। আর ছলিয়ার জন্যও দেই।"

রাত্রে মা ব্রহ্মকুণ্ডে গেলেন। আমরাও মার সঙ্গে ব্রহ্মকুণ্ডে গেলাম। মাকে স্পর্শ করে নির্বাণদা পূজা করলেন। আমরা গঙ্গার স্তব পাঠ করলাম। গঙ্গার আরতি হল। খুব ভীড় ছিল, তবে সুন্দর ব্যবস্থা ছিল। পূজা দেখে চলে এলাম। রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত সাধুদের ভাষণ হল। মাতৃ সৎসঙ্গ আর হল না। মাকে প্রণাম করাতে মা আমাকে পাথরের মালা এবং কতগুলি জিনিষ আশ্রমে নিয়ে যেতে বললেন।

মা—"কার সাথে কিসে করে যাবি?"

আমি—"কমলাজীর সাথে।"

মা প্রতিদিনই রাত্রিতে জিজ্ঞাসা করতেন, "কার সাথে যাবি?" মায়ের খুব খেয়াল ছিল। মার আরতির সময় আমরা আজ ১২জন এক-সঙ্গে আরতির থালা নিয়ে আরতি করলাম।

আরতির পর মা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের জনৈক সাধুর সঙ্গে কথা বল-লেন। তাঁকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল, তিনি আসেননি।

স্বামীজী—"মা, বুঝতে ভুল হয়েছে। আমি ভেবেছি কাল আসতে হবে। ফোনে বলেছিল তো।"

মা—"খুব ভাল হয়েছে, আস নাই বাবা। গিয়ে নিমন্ত্রণ করতে হয়। ফোনে কি নিমন্ত্রণ হয়? সব সময়ের জন্য জানা হয়ে গেল।"

সেদিন অনেক মহন্তদের ভাণ্ডারা ছিল। রাত্রে মাতৃ সৎসঙ্গ হল। অনেক ভীড় হত সৎসঙ্গে। প্রশ্ন উত্তর হত।

২৪শে মে

আমরা বিকালে মার কাছে গিয়েছি। মাকে প্রণাম করে সৎসঙ্গে বসেছি। সৎসঙ্গের পর মার কাছে এসেছি। মা বিশ্রাম করছেন দেখে মার কাছে গেলাম। আমি মাকে বাতাস দিচ্ছিলাম। আমি মাকে দেখে ভাবলাম, "আমার কত ভাগ্য যে মায়ের কাছে এত লোক আসছে এবং পূজা করছে, সেই মাকে আমি হাওয়া দিচ্ছি।" মার কথা মনে আসাতে আমি ঠিকমত হাওয়া দিতে পারি নাই।

মা—"কে রে, কে বাতাস দিচ্ছিস্ ?"

আমি—"মা, আমি জয়া।"

মা—"তুই পারছিস না, দে আমাকে পাখা দে। আমি হাওয়া পাচ্ছি না।" এই বলে হাত বাড়ালেন।

আমি এই কথা শুনে বললাম—"মা, আমি জোরে জোরে হাওয়া দেব।"

বোধহয় মা আমার অহঙ্কার ভাঙ্গবার জন্যই এই মন্তব্য করলেন।

রাত্রে মাতৃ সৎসঙ্গের পর আশ্রমে ফিরে এলাম।

২৫শে মে

মা আজ সকালে আশ্রমে এলেন, কারণ যজ্ঞের পূর্ণাহুতি ছিল। শিব মন্দিরের সামনে যজ্ঞ হল। মা এসেই ভোলাদাকে বললেন, "অগ্নি প্রজ্বলিত কর।" তারপর মাকে স্পর্শ করে পূর্ণাহুতি হল। ৯ জন কুমারী পূজা হল। ১২জন ব্রাহ্মণ ভোজন হল। মা আশ্রমে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে পূর্ণানন্দ আশ্রমে ফিরে গেলেন।

আজ রাত্রে মায়ের পূজা। অনেক সাধুদের ভাষণ হল। অনেক মহাত্মাদের আগমন হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে ১০০৮ শ্রীবিষ্ণু আশ্রমজী,

১০০৮ শ্রীঅখণ্ডানন্দ স্বামীজী, ১০০৮ শ্রীঅমর মুনিজী, ১০০৮ শ্রীহংস প্রকাশজী, ১০০৮ শ্রীব্রহ্মানন্দজীর নাম উল্লেখযোগ্য। সারা রাত আমরা পূজার জোগাড় করলাম। মার জন্য বেলফুল এবং শোলা দিয়ে ঘর সাজান হয়েছিল। রাত্রি পৌনে ৩টায় পূর্ণানন্দ স্বামীজী এবং মহন্তজী মাকে রূপার সিংহাসনে বসালেন। মা হলে এলেন। প্রথমে দাস্থদা ধূপ ও প্রদীপ নিয়ে, তারপর আমি গঙ্গাজল নিয়ে, তারপর বড় মেয়েরা শঙ্খ ও কাঁসর ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে মাকে নিয়ে এল। বাদ্যধ্বনি উলুধ্বনি ও বেদপাঠের সঙ্গে পূজা শুরু হল। কীর্তনও জমে উঠল। ভোর ৪টায় সাধুদের আরতি ও ভেট দেওয়া হল। পূজার পর যজ্ঞ হল। সবাই প্রণাম করল।

আমি আশ্রমে চলে এলাম। মা সন্ধ্যায় আশ্রমে এলেন। সেদিন নাম যজ্ঞ হবে। মা হলে এসে বসলেন। মঞ্চ সাজিয়ে কীর্তন শুরু হল। মা ছেলেদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে কীর্তন করে তারপর মেয়েদের কীর্তন করতে বললেন। ছবিদি কীর্তন শুরু করলেন। সব দরজা মা বন্ধ করে দিলেন। মা হাত উঠিয়ে কীর্তন করছিলেন। গান করে ছবিদিকে সুর শেখালেন। ধীরে ধীরে গান করতে করতে মা বিশ্রাম করতে চলে এলেন।

ভোরে কীর্তনের পর মার কাছে সকলে গেল। মা সকলকে বাতাসা দিলেন।

তার পরদিন আমি কন্যাপীঠের মেয়েদের বিষয়ে কিছু কথা বললাম। গীতা পরীক্ষার জন্য মাকে মালা দিল।

মা বললেন—"এম্‌-এ পড়ছে বুঝি ?"

মেয়েদের বিষয়ে কোন কথা বলাতে মা বললেন, "এ শরীর তো কাউকে দোষ দেয় না, দেবেও না। ভগবান্ যা করান, তাই তো হয়। এ শরীর তো কিছু বলে নাই।" আরও অনেক কথা বললেন।

৩০শে মে কাশী আসব। মার সাথে কথা বললাম। রাত্রে মা আমাদের ফল দিলেন। রাম ভাইএর দিকে তাকিয়ে মা বললেন—

"ইহলোগ কন্যাপীঠ কী লড়কী হ্যায়, পঢ়াতী হ্যায়, রাস্তা কা ইয়ে লোগ খাতী নহীঁ, ফল খরীদ কর খাতী হ্যায়।"

আমাদের ছোট এক টুকরী ফল দিলেন। নারায়ণ স্বামীজী আমাদের সঙ্গে ছিলেন। মা স্বামীজীকে বললেন—"সাবধানে যেও। পৌঁছে খবর দিও।"

মা আমাদের মাথায় পিঠে হাত দিলেন। মাকে প্রণাম করে রওনা হলাম।

১৯৮০ সনের ১৫ই ডিসেম্বর

বারাণসী (কাশী) আশ্রমে ভাগবত সপ্তাহ চলছে। দুপুরে মায়ের অনন্য ভক্ত চিত্রা ঠাকুর মাকে শিব সাজালেন। মাথায় বড় জটা, ত্রিনেত্র, সাপ, গায়ে ব্যাঘ্রচর্ম, হাতে ত্রিশূল ও ডমরু দিলেন। মাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল। আমরা সাক্ষাৎ শিব দর্শন করলাম।

গুণীতা ও কৃপালজী ভাগবত পারায়ণ করাচ্ছিলেন। মা গুণীতাকে বললেন, "দেখো, তুম্হারা ভাগবত মে শিবজী আ গয়ে।" এই বলে ডমরু বাজালেন।

১৯৮২ সনের ৩০শে জানুয়ারী

মা বিন্ধ্যাচল থেকে কাশী এসেছেন। আজ সরস্বতী পূজা হল। পূজার সময় মা বললেন, "একটু কাঁসর ঘণ্টা বাজানা রে।" মা পূজা আরম্ভ হলেই বাজনা বাজাতে বলতেন। কারণ বাদ্যধ্বনিও পূজার একটা অঙ্গ। কীর্তনের পর মা বললেন, "তোমরা ৫ মিনিট ধ্যান করো। বলো, হে ব্রহ্মবিদ্যাদায়িনী, তুমি আমাদের মধ্যে প্রকাশিত হও জ্ঞানরূপে।"

মা মণ্ডপে বসে বললেন, "বইগুলো বেদীতে দিতে পারলি না? বইএর পূজা হয়।" কিছু বই আলাদা টেবিলে ছিল। পূজার সমস্ত উপকরণ মা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখতেন।

★

চার

প্রেরণা ও উৎসাহ দান

চার

প্রেরণা ও উৎসাহ দান

শ্রীশ্রীমা অধ্যয়ন-অধ্যাপন বিষয়ে এবং অন্যান্য শিক্ষার ক্ষেত্রে সব-সময় আমাদের উৎসাহ বর্ধন করতেন। বিশেষ করে দেবভাষা সংস্কৃত শিক্ষায় আমাদের সামান্যতম কৃতিত্বের জন্যও মা ভূয়সী প্রশংসা করতেন। এমন বহু ঘটনা মনে পড়ে। একদিন মা আমাদের বলে-ছিলেন, "তোমরা বড় মেয়েরা ছুটির দিনে সংস্কৃতে কথা বলবে, সৎ আলোচনা করবে।"

১৯৮১ সালে অতিরুদ্র মহাযজ্ঞ উপলক্ষে শৃঙ্গেরী মঠের অধীশ্বর শ্রীশঙ্করাচার্য্যজী কনখলে উপস্থিত ছিলেন। কন্যাপীঠ থেকে আমরা বহু সংখ্যক মেয়েরা গিয়াছিলাম। সৎসঙ্গ প্রকোষ্ঠে মাতৃসান্নিধ্যে আমরা উপস্থিত ছিলাম। মা আমাদের দেখিয়ে শ্রীশঙ্করা-চার্যকে বলতে লাগলেন, "বাবা, এই সব মেয়েরা আচার্য পাশ করেছে, এম্. এ. পাশ করেছে।" আমাকে দেখিয়ে বললেন, "বাবা, এ বেদান্তে আচার্য পাশ করেছে।" চন্দনদিকে দেখিয়ে বললেন, "বাবা, এ পুরাণাচার্য।" শ্রীশঙ্করাচার্য মহারাজজীকে স্বাগত অভিবাদন জানিয়ে আমি সংস্কৃতে কিছু বললাম। উনি খুব প্রসন্ন হলেন।

মা আমাদের বলতেন অবসর সময়ে সংস্কৃতেই কথাবার্ত্তা বলতে। মায়েরই প্রেরণায় আমরা ঠাকুর ঘরে, পূজামণ্ডপে পূজার কাজে নিযুক্ত থাকা অবস্থায় সংস্কৃত ছাড়া অন্য কোন ভাষায় কথা না বলার নিয়ম পালনের চেষ্টা করি।

আধ্যাত্মিক জীবনের বিভিন্ন দিক্ নিয়ে পড়াশুনা, লেখা ও বক্তৃতা

দেওয়া—মেয়েরা এ সব যে যেমন পারে, তাদের প্রতিভা অনুসারে মা খুব উৎসাহের সঙ্গে করাতেন। সারস্বত সাধনাকে অধ্যাত্মসাধনার ধারার সঙ্গে কিভাবে মিলিয়ে নিতে হয় মা সুন্দরভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন।

১৯৭৪ সনের ১৫ই জুলাই

রাত্রিতে মেয়েরা মাকে প্রণাম করতে গিয়েছে। মেয়েদের গানের পরীক্ষা। তাই মেয়েরা মাকে মালা দিল। প্রতিটি পরীক্ষার আগে অর্থাৎ গান, সেলাই, পড়াশুনা সব বিষয়েরই পরীক্ষার আগে মেয়েরা মাকে মালা দিত। মাও মেয়েদের উৎসাহ ও উপদেশ দিতেন।

সেদিন মেয়েরা গাছের জুঁই ফুল দিয়ে মায়ের মাথার এবং হাতের জন্য মালা বানাল। মা বেশ মন দিয়ে মালা দেখে বললেন, "তোমরা মালী হয়েছ দেখ্‌ছি, মালীরটা দেখে দেখে তোমরা শিখেছ।" পুনরায় বললেন, "খুব ধৈর্য্য লাগে।"

মা সব মেয়েদের মালা দিলেন। মেয়েদের প্রতি মায়ের খুব খেয়াল। মালাদির শরীরটা ভাল যাচ্ছে না দেখে মা বেশী করে খেতে বললেন।

মেয়েরা মাকে জন্মাষ্টমীতে আসার জন্য অনুরোধ করাতে মা বললেন, "জন্মাষ্টমীর এখনও ঠিক হয় নাই, এখনও কিছু বলা যায় না। এ শরীরের যেখানে ইচ্ছা থাকবে। কিছু বলতে পারব না এখন।"

১৯৭৪ সনের ১৫ই সেপ্টেম্বর

কনখলে দুর্গাপূজাতে কন্যাপীঠের মেয়েরা কয়েকজন শুদ্ধাচারী হতে চেয়েছে। মা সব সময়েই মেয়েদের উৎসাহ দিতেন। মা বললেন, "তোমরা গঙ্গা স্নান করে ১ হাজার জপ করে, পঞ্চগব্য খেয়ে চণ্ডীর রান্না ঘরে ঢুকবে।" মেয়েরা তাই করল। পরদিন সব মেয়েরা কিছু কিছু রান্না করে মাকেও খাওয়াল। মা মেয়েদের প্রশংসা করলেন।

দুপুরে খেতে বসে মা আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, "মেয়েটা না

খেয়ে না দেয়ে কত পরিশ্রম করছে। চুপচাপ কাজ করে। মোটা হয়ে গেছে তো, তাই কষ্ট হয়। আগে তো রোগা ছিল।" তারপর মা জিজ্ঞাসা করলেন কে রান্না করেছে? আমি বললাম, "তুলসীদি।"

মা—"তাই আজ একটু খেতে পারছি।"

তুলসীদি—"মা, উদাসজী রান্না করতে দেয় না।"

মা—"তুই শুনিস্ না, ওকে গুরু বানাস্ না।"

উদাসজীকে মা বললেন—"তুই এত কাজ করিস্, সকলকে খারাপ কথা বলিস্ কেন?"

গীতাকে বললেন, "জুসটা শিখে নে।" গীতার বিষয়ে বললেন, "ওর রান্নার আগ্রহ আছে।" চন্দনদিরও প্রশংসা করলেন। "চন্দনও কত কাজ করে, দুই বুড়ীকে সামলায়, দরকার হলে রান্না করে, পরিবেশনও করে।"

স্বামীজীরও প্রশংসা করলেন—"পরমানন্দ সব কাজ করে, তরকারী কাটে, বাথরুমও পরিষ্কার করে। তোমরাও সবদিকে যোগ্য হও। আলস্য ত্যাগ করবে, ভগবান যখন শরীর ও মন দিয়েছে তখন আলস্য একদম করবে না।" সকলের দিকে তাকিয়ে, "আলস্যকে আলস্য করতে হবে।"

তারপর মা বিশ্রাম করে আমাদের উঠানে এসে বসলেন। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "জয়া, খেয়েছ?"

দাদাভাই এর সাথে দেখা করলেন। দাদাভাইকে বললেন, "দিদি, তুমি না খেয়ে না দেয়ে বসে আছ?"

দাদাভাই বললেন, "মা, খেয়ে সময় নষ্ট করব? যতক্ষণ তোমাকে পাই! তুমি ভাল থেকো, আবার তাড়াতাড়ি এস।"

মা বললেন, "তোমার জন্যই তো এ সব করেছি। আবার তো কিছুদিন পর আসবই।" মা রওনা দিলেন। আমি প্রণাম করাতে

মা বললেন, "তোমাদের তো খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে ? ভাল হয়েছে। তোমাদের জন্যই তো বসে ছিলাম।"

মা মাথায় হাত দিয়ে হেসেহেসে কথা বললেন।

মা এলাহাবাদ রওনা হচ্ছেন। সেখানে এক রাত থেকে চিত্রকুট যাবেন। চিত্রকুট থেকে এখানে এসে আবার এক রাত থাকবেন।

সন্ধ্যাবেলা আমরা মায়ের সঙ্গে কথা বলছিলাম। মা গীতা, গুণীতা, গৌরী ও আমাকে ডেকে বললেন, "পুরাণ পুরুষের বিষয় কিছু লিখে ফেল। আজ গুরুবার, আজ থেকে শুরু কর।"

আমি বললাম, "আমি তো পুরাণ পড়িনি ?"

মা বললেন, "বেদান্তের ওপর লেখ। কেউ কারুরটা দেখবে না।"

মাকে জিজ্ঞাসা করলাম কোন্ ভাষাতে লিখতে হবে। মা বললেন, "প্রথমে একটু সংস্কৃতে লিখে তারপর হিন্দীতে লিখবে।"

১৯৭৫ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী

পুরস্কার বিতরণ উৎসবে মেয়েদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ভাষণ ইত্যাদি ভালো হওয়ায় মা খুব প্রসন্ন। রাত্রিকালে মা ছোট ছোট মেয়েদের বললেন, "তোমরাও বড় হয়ে এরকম করবে।" আমি মাকে অনুরোধ করলাম ছোট মেয়েদের একটু বলতে তারা যেন মন দিয়ে পড়ে। মা বললেন, "বলতে হবে কেন ? নিজেরাই পড়বে।" যদিও মন দিয়ে লেখাপড়া করা মা-ই আমাদের নিয়মাবলীর অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছেন। তবুও আমার নালিশ শুনে মা যে ছোট মেয়েদের সামনে শুধু এইটুকুই বললেন, যে ওরা নিজেরাই পড়বে, তা মনে হয় ওদের মনে আত্মবিশ্বাস ও উৎসাহ জাগাবার জন্যই।

একদিন কথায় কথায় বেলুদি মাকে বললেন, "মেয়েরা গানে আর রান্নাতে সকলকেই খুশি করতে পারে।"

মা তৎক্ষণাৎ বললেন, "ব্যবহার সবচেয়ে বড়। পড়াশুনা না

জানলেও ব্যবহার ভাল করতে হয়।" মায়ের এই উক্তিটি সকলের মনে রাখার মতন। মেয়েদের বিদ্যাচর্চা, গান বাজনা, রন্ধনে দক্ষতা ইত্যাদির জন্য মা নিজেই কত প্রশংসা করেছেন। তথাপি ব্যবহার—কুশল না হলে, অন্তঃকরণ পবিত্র না হলে, মানুষের উপযুক্ত আচরণ করতে না পারলে যে সব গুণ, সব শিক্ষা ব্যর্থ মা সেই কথাই জানিয়ে দিলেন। নিজের গুণবত্তা নিয়ে কারুর মনে গর্ব উদয় হলেই মা এভাবে আমাদের সচেতন করে দিয়েছেন।

সেই বছরেরই কথা। গীতাজয়ন্তী সবে শেষ হয়েছে। ১৫ই ডিসেম্বর গীতা প্রসঙ্গে মায়ের সাথে আলোচনা হচ্ছিল। মা বললেন, "তোমরা জ্ঞান ও ভক্তি বিষয়ে লেখা তৈরী কর। নিজের নিজের ভাবে প্রত্যেকে শেখ! কারও জন্য নয়। নিজেদের পরমার্থের জন্য। তোমরা বড়রা নিজের মতে বিচার কর। ছোটদের তো মত বদলায়। তোমরা বড়রা আগে নিজে সেই পথে চল।"

আমি বললাম, "আমি গীতাকে মা-রূপে দেখতে চাই।"

মা বললেন, "পরে হবে, এখন হবে না। গীতা সম্বন্ধে অনেকের অনেক মত আছে, আগে সেইসব বিচার কর। 'মা' মানে 'ময়', আর যিনি মাপ করে নেন। সর্বময় বলেই গীতাকে মা'র রূপে দেখা।"

১৯৭৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বার্ষিক উৎসবের প্রাক্কালে মা এসেছেন। আমার উপরে ভার এসেছে কন্যাপীঠের বার্ষিক বিবরণী পাঠের। বহু গণ্যমান্য পণ্ডিতের ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের আগমন হবে। তাঁদের সাক্ষাতে বক্তৃতা দেবার মত সাহস আমার নেই। মাকে বললাম, 'মা, বলতে ভয় করে।"

মা বললেন, "ভয় কেন করবে? নির্ভয়ে বলবে।"

২০শে ফেব্রুয়ারীর কথা। আগের দিন বার্ষিক উৎসব ভাল ভাবেই সম্পন্ন হ'য়েছে। দুপুরে খেতে বসে মা অনুষ্ঠান সম্বন্ধে কথা বলছিলেন। পটলদাও উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, "গীতা খুব ভাল বলেছে।"

মা বললেন, "গুণীতাও ভাল বলেছে। গৌরীও কেসে কেসে ভালই বলেছে।" একটু থেমে মা আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "বেশ ভাল! তোমরা এখন থেকে সংস্কৃতে সব তৈরী করে কথা বোলো। গীতা জয়ন্তীতে তোমরাই বলবে, বাইরের বক্তা আসবে না। মেয়েদের প্রচারের জন্য নয়, সকলের উৎসাহের জন্য। ... সকলে খুব পট্ পট্ করে বলেছে, কেউ ঘাবড়ায় নি।" মা মেয়েদের সব প্রাইজ দেখলেন।

মা আমাদের স্বাবলম্বী হতে সর্বদাই উৎসাহ দিতেন। একদিন কন্যাপীঠের পঠন পাঠন সংক্রান্ত বিষয়ে মায়ের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। মা বললেন, 'তোমরাই পড়াতে পার না? পণ্ডিতদের কি দরকার? তোমরা এক একজন এক এক বিষয় নিয়ে পড়েছ—তোমরাই তো পড়াবে।"

বেলা একটার সময় মা নৈমিষারণ্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। সেখানে উৎসব হবার কথা। যাত্রাকালে তুলসীদির মুখ গম্ভীর দেখে মা বললেন, "তুমি গোম্ড়া মুখ দেখালে, ঠিক আছে! একটু হাসলেও না?" ইত্যাদি। অন্নপূর্ণা মন্দির, গোপাল মন্দির ও শিব মন্দিরে মালা দিয়ে সবার সাথে দেখা করে মা রওনা হলেন।

১৯৭৬ সনের ৫ই মে

মা এসেছেন। আশ্রমের দোতলায় এসে মা আমাদের সঙ্গে দেখা করলেন। গুণীতা এসে মাকে প্রণাম করল। মা বললেন, "কেমন আছ?"

মিনু এসে প্রণাম করাতে মা বললেন, "ভাল করে আচার্য পরীক্ষা দিও।"

গৌরীকে বললেন, "তোমার লেখা খুব সুন্দর।"

কান্তিজী আর বাণীদিকে বললেন, "তোমরা খুব সুন্দর অতিথিসেবা করেছ। সকলে খুশি হ'য়েছে।"

মায়ের এরূপ উৎসাহবর্ধক বাণী শুনে তো প্রত্যেকেই মহাখুশি!

১৯৭৭ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী

মা আমাদের সঙ্গে বসে আগামী পুরস্কার বিতরণী উৎসব সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা বলছেন। এবারে উত্তর প্রদেশের গভর্নর ডাঃ চেন্না রেড ডী আমাদের উৎসবের প্রধান অতিথি হয়ে আসবেন। মা জিজ্ঞাসা করলেন, "এই গীতা, জয়া, তোমরা গবর্নরকে কি দেবে ?"

আমি বললাম, "আমরা তো ফল, মিষ্টি দেই।"

মা বললেন, "এ রাম, ফল মিষ্টি দেবে ? সেলাই দিতে পার না ?"

মেয়েদের করা সেলাই এনে মাকে দেখালাম। একটি ব্যাগের উপর মুরগী আঁকা দেখে মা বললেন, "এ রাম, ভগবানের ছবি আঁকবে তা না, মুরগী এঁকে রেখেছে !"

দুপুরে খাওয়ার সময় মা আমাকে বললেন, "মিছরীর জল খেয়ে বলবে। ঘাবড়াবে না" ইত্যাদি। বেশীক্ষণ কথা বললে আমার গলা শুকিয়ে যায়— উৎসবের দিন আমাকেও কিছু বলতে হবে, তাই মায়ের এই ব্যবস্থা।

উৎসব শেষে মা গুনীতা, শুক্লা প্রভৃতিকে ভাল বক্তৃতার জন্য প্রশংসা করলেন। গৌরী সেবার হলে আসেনি, কিন্তু অন্য কারুর কারুর জন্য বক্তৃতা তৈরী করে দিয়েছিল। পুষ্পদি বললেন, "গৌরী সব লিখে দিয়েছিল, ও সামনে আসতে চায় না।"

মা বললেন, "ত্যাগের দিক।"

১৯৭৭ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী

আজ মা কথায় কথায় বলছিলেন, "গীতা জয়ন্তী সাত দিন কিংবা তিন দিন ধরে করবে। তোমরাই বলবে। তোমাদের বলার দিক্ খুলে যাবে। পদ্মাকেও বলতে বলবে।"

এবার মা গীতাকে বলতে লাগলেন, "মেয়েরা বেশ দাঁড়িয়ে গেছে। আর একটা দিক্ হবে। দিদির আদর্শ—অন্য মেয়েদের দাঁড় করিয়ে

নিজের নিজের তপস্যায় নিজেরা যাবে। সৎসঙ্গ করবে, পাঠ করবে, নিজেদের রান্না নিজেরা করবে। গঙ্গার তটে বা যখন যেখানেই থাকবে, ওই নিয়েই থাকবে। কুমারী সেবা—ভগবানের কাছে প্রার্থনা—'তুমি করুণা করে এই পথে চালিয়ে নাও। ... ... যারা গৃহস্থাশ্রমে যাবে, তারা নিজেদের ছেলেমেয়েদের বড় করে যদি এই পথে আসতে চায়, আসতে পারে। তারা তোমাদের সাহায্য করবে। আর তোমরা তাদের এই পথে অনুকূল ভাবে সাহায্য করবে।"

আমাদের অর্থাৎ বড় মেয়েদের লক্ষ্য করে মা বললেন, "এখন তোমরা তৈরী হয়েছ, অন্যদেরও তৈরী কর।"

১৯৭৭ সালের ৪ঠা মার্চ্চ

আজ মা আমাদের বললেন, "তোমরা বলার দিক্‌টা ঠিক করো। উগ্রভাব থাকবে না। অহংকার থাকবে না। আমি বক্তা এই ভাব রাখবে না। নির্ভয়ে, সুন্দর, শান্তভাবে বলবে। তোমরা যখন যোগ্য হয়েছ, তখন সব দিকে তৈরী হও। পৈতা নিয়েছ।" সব দিকে যোগ্য হওয়ার প্রসঙ্গে মা পরমানন্দ স্বামীজীর প্রশংসা করলেন। স্বামীজী দরকার পড়লে সব কিছুই করেন, তরকারী কেটে দেন, ঘরদোর পরিস্কার করেন, মান অভিমান নেই। মা আরও বললেন, "আলস্য ত্যাগ করবে। যখন ভগবান্ তোমাদের শরীর ও মন দিয়েছে, তখন আলস্য একদম করবে না।"

১৯৭৭ সালের ৩১শে মার্চ

মাকে প্রণাম করতে গিয়ে দেখি মামীমার সাথে মা কথা বলছেন। অনেক লোক মার দর্শনে এলেন। তারপর মায়ের ভোগ হল।

মা আমাকে দেখে বললেন, "কি ভাল রান্না হয়েছে।"

আমি—"মা, তুলসীদি রান্না করেছে।"

তুলসীদির দিকে তাকিয়ে মা বললেন, "কি করে রান্না করিস?

অপূর্ব হয়।" ডাল তরকারী সব মিশিয়ে মা একটু মুখে দিয়ে বললেন, "এত সুন্দর কোন দিন খাই নাই।"

মায়ের ভোগের পর মা জেনারেল কিচেনে প্রসাদ দিয়ে আসতে বললেন। পায়েস রান্না হয়েছে কিনা জিজ্ঞাসা করলেন।

মায়ের রান্না একটু ভাল হলেই মা প্রশংসা করতেন।

মা দেরাদুন থেকে কনখল এলেন। মার শরীর খুবই ক্লান্ত। সেদিন মার কাছে একজন মন্ত্রী এসে ছিলেন। মা বললেন, "আমি তো তোমাকে অনেক আগে দেখেছি।"

মন্ত্রী মহাশয়ের যাওয়ার পর আমি মার কাছে গিয়েছি। মা বললেন, "তুলসীকে বল রুটি, ফালি ফালি আলু ভাজা আর পটল ভাজা জল্‌দী করে নিয়ে আসতে।"

আমি আর তুলসীদি মিলে খুব তাড়াতাড়ি করে খাবার করে নিয়ে এলাম। মা খুব ভাল খেলেন। মা তুলসীদির খুব প্রশংসা করলেন। মা বললেন, "ও যা করে তাই ভাল হয়।"

একটু কিছু করলেই মা খুব প্রশংসা করতেন এবং উৎসাহ দিতেন। মায়ের একটু উৎসাহ পেলেই আমাদের মনে জোর এসে যেত।

১৯৮২ সালের ১লা জানুয়ারী

আমরা কন্যাপীঠের মেয়েরা এবং বড়রা মাকে প্রণাম করতে গিয়েছি। মা সকলের মাথায় হাত দিলেন। মেয়েদের প্রণামের পর গুণীতা ওর কৃষ্ণ নিয়ে মাকে দেখাল। গুণীতা রোজ মায়ের দেওয়া কৃষ্ণ পূজা করে। মা কৃষ্ণকে হাতে নিয়ে বললেন, "বাঃ সুন্দর, বহুত আচ্ছী তরহসে পূজা লে রহে হো ন।" খুব হাসি হাসি মুখ। মা নিজের মাথায় স্পর্শ করলেন। গুণীতার মাথায় হাত দিয়ে বললেন, "গুনু, গুণীতা, গুণবতী" ইত্যাদি। উদাসজী বললেন, "গুণীতার মত মেয়ে চাই, এরকম আরও

মেয়ে থাকলে ভাল হয়।" মা বললেন, "দেখ, কি বলছে গুণীতার মত মেয়ে চাই।" গুণীতার পর আমার মাথায়ও হাত দিয়ে বললেন, "জয়ার জয়-জয়-কার।"

কান্তিজীকে দেখে দুটো হাত ঘুরিয়ে বললেন, "সব কা—ন্তি।" এই বলে খুব হাসলেন। মেয়েরা সকলে প্রণাম করল।

"তোমাদের জন্যই এই শরীরের যা কিছু বলা-চলা কাজকর্ম্ম ঘোরাফেরা। তোমাদের জন্যই এই শরীরটাকে যখন যা হয় তোমরা করিয়ে নেও।"

—শ্রীশ্রীমা

পাঁচ

স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা

মেয়ে থাকলে ভাল হয়।" মা বললেন, "দেখ, কি বলছে গুণীতার মত মেয়ে চাই।" গুণীতার পর আমার মাথায়ও হাত দিয়ে বললেন, "জয়ার জয়-জয় কার।"

কান্তিজীকে দেখে তুটো হাত ঘুরিয়ে বললেন, "সব কা—ন্তি।" এই বলে খুব হাসলেন। মেয়েরা সকলে প্রণাম করল।

"তোমাদের জন্যই এই শরীরের যা কিছু বলা-চলা কাজকর্ম্ম ঘোরাফেরা। তোমাদের জন্যই এই শরীরটাকে যখন যা হয় তোমরা করিয়ে নেও।"

—শ্রীশ্রীমা

পাঁচ

স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা

পাঁচ

স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা

আমাদের অসুখে-বিসুখে মা যে পথ্য ও স্বাস্থ্যের নিয়ম নির্দেশ করতেন, তা হু-বহু পালন করতে পারলে বার বার দেখেছি প্রত্যক্ষ ফল পাওয়া যেত। মা সর্বদা স্বাস্থ্যের কথা জিজ্ঞেস্ করতেন, প্রত্যেকের খবর নিতেন। মা নিজে কন্যাপীঠের মেয়েদের জন্য যে সকল বিধি-নিষেধ দিয়েছেন, তার মধ্যে অন্যতম নিষেধ হল স্বাস্থ্যের প্রতি অমনোযোগী হওয়া। স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম পালন না করাকে মা অপরাধ ব'লে গণ্য করতেন। আমরা যাতে স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মাবলী পালন করি সেদিকে মায়ের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। মা যে কত বড় চিকিৎসক, তার প্রমাণ পেয়েছি বহুবার। কিছু উদাহরণ দিচ্ছি।

১৯৭৫ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী

মা কাশীতে এসেছেন। রাত্রে আমি নিজের ও অন্যান্য মেয়েদের অসুখ-বিসুখ, শারীরিক দুর্বলতা ইত্যাদি বিষয়ে মাকে জানালাম। মা সব মেয়েদের চূণের জল খাওয়াতে বললেন। মা বললেন, "মেয়েদের তো ভালই দেখলাম। তবে এটা শুরু করে দেও। পরিষ্কার চূণের জল খাওয়াবে। রাত্রে জল দিয়ে রাখবে।"

অসুস্থ অবস্থায় ঠিকমত খাওয়া দাওয়া না করলে মা বলতেন, "ইন্‌জেক্‌সন্ দিলে যেমন ব্যথা করে, রোগও তো ভাল হয়, সে রকম খেতে ভাল না লাগলেও ঔষধের মত খেতে হয়।"

আমাদের পূজোর কাজ সম্পন্ন হ'লেই মা বলতেন কিছু খেয়ে নিতে। একদিন আমি এ কথা সে কথায় দেরি করছিলাম। মা হলঘর থেকে

নিজের ঘরে যাওয়ার সময় আমাকে ডেকে বললেন, "তুমি এক্ষুনি খেয়ে নাও, দেরি করো না।" মায়ের দৃষ্টি সর্বত্র প্রসারিত।

শুধু একবার নয়, বহুবার এরকম ব্যক্তিগত ভাবে মা খোঁজ নিতেন আমরা ঠিকমত খাই শুই কিনা। একদিন রাত্রে আমি মায়ের কাছে বসেছিলাম। আমাদের শুতে যাবার সময় পার হয়ে গিয়েছিল। আমি বসে ছিলাম, মা শয্যা গ্রহণ করলে মশারি ফেলে দেব সেই জন্য। উদাসজীও বসেছিলেন। আমাকে বসে থাকতে দেখে মা জিজ্ঞাসা করলেন, "এত রাত করছিস্ কেন? শুতে যা।" আমি বললাম, "অনসূয়াজী আর উদাসজী থাকতে বলেছেন।" মা বললেন, "উদাস, তুমি মশারি ফেলতে পার না? না পারলে আমাকে বললেই পারতে, আমি ব্যবস্থা করতাম। ...যা, যা, শুতে যা, ওর কথা শুনিস্ না।"

১৯৭৫ সালের কথা। মা একদিন খোঁজ নিলেন আমার শরীর কেমন আছে। বললাম শরীর ভাল নেই, পেট খারাপ। মা আমাকে আদা বাটা দিয়ে ভাত ও সাজ দই খেতে বললেন।

মা কাশীতে। দাদাভাই-এর শরীর ভালো নেই। অরুচির ফলে তাঁর নিয়মিত আহারের ব্যতিক্রম হচ্ছে কিছুদিন ধরে। মায়ের বিশেষ খেয়াল যে তাঁর খাওয়া দাওয়া স্বাভাবিক হোক্। রাত্রে মা আমাকে বললেন, "দিদির জন্য একটু পিঠা কর। বলবি না যে, আগে আপনি খেতেন, এখন খান্ না কেন? শুধু বানিয়ে তুলসীকে দিয়ে দিবি। তুলসী খাইয়ে দেবে। আগে একটু আমাকে দিস্। দিদিকে বলবি মা'র প্রসাদ।"

পেটে আল্‌সার হলে মা বলতেন কাঁচা বেল সিদ্ধ করে অথবা পাকা বেল বিচি ও আটা শুদ্ধ খেতে।

১৯৭৫ সালের ২০শে জুন

আজ মা কাশীতে এলেন। এসেই সকলের সঙ্গে দেখা করে বরা-

বরকার মত কুশল প্রশ্ন করলেন, "কেমন আছ ?" নারায়ণ স্বামীজীর খুব ফোড়া দেখে মা বললেন, "ফোড়া হলেই গরম তেল লাগাবে, তা'হলে ভাল হবে।" তারপর অন্নপূর্ণা মন্দির ও দোতলার ঘরগুলি দেখে বললেন, "ভগবান্ সব ধুয়ে দিয়েছে। পরিষ্কার হয়ে গেছে।" মা আসার আগে খুব বৃষ্টি হয়েছিল। অতঃপর গোপী বাবার শারীরিক কুশল জিজ্ঞাসা করে মা গোপাল মন্দিরে গেলেন।

১৯৭৬ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী

দুদিন পর আমাদের বার্ষিক উৎসব। রাত্রে মাকে প্রণাম, করতে গেলাম। মা বললেন, "কেমন আছ গো ?"

আমি বললাম, "ভাল, তবে পেটটা ভাল থাকে না।"

মা—"আদা বাটা দিয়ে ভাত খাস্, আর গেঁদাল পাতা বেটে কড়াইয়ে নেড়ে তাই দিয়ে ভাত খাস্।"

আমি—"লোভ করে বেশি খেয়ে নি।"

মা—"সাবধানে খাবে। খাওয়ার পর যোয়ান আর আদা খাবে। সুক্তা আর ঝোল খাবে। পেট ভাল হলে দুর্বলতা কমে যাবে। সর্দির জন্য মিছরির জল খাবে। চূর্ণের জল, চিরতার জল বেশি করে খাবে। খাওয়ার পর একটু বিশ্রাম করে নিও।"

১৯৭৬ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী

আজ আমাদের বার্ষিক উৎসব শ্রীশ্রীমায়ের উপস্থিতিতে সুন্দর ভাবে পালিত হল। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব গ্রহণ করেন উত্তর প্রদেশের গবর্ণর ডাঃ চেন্না রেড্ডী।

গবর্ণর সেদিন রাত্রে পরিবারবর্গের সঙ্গে প্রসাদ গ্রহণ করেছিলেন। হঠাৎ তাঁর দু'মাসের নাতনীটি পেটের ব্যথায় কাঁদতে শুরু করল। তাকে কোন উপায়েই সুস্থ বা শান্ত করা যাচ্ছিল না। তাকে ক্রমাগত কাঁদতে

ও ছটফট করতে দেখে সকলে খুব চিন্তায় পড়লেন। মা শুনতে পেয়ে এসে ওর পেটে ও পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। মা ওকে যোয়ানের জল খাওয়াতে বললেন। ডঃ চ্যাটার্জী এসে ওষুধ দিলেন। মেয়েটি ভাল হল।

পরদিন বিদায় গ্রহণ কালে গবর্ণরের স্ত্রী বললেন, "মায়ের কাছে এসেছি বলেই মেয়েটি ভাল হল। অন্য জায়গায় হলে কি হত, জানি না।"

মায়ের কাছে পরে শুনলাম যে আগের দিন রাত্রে মা দেখেছিলেন যে শিশু কন্যাটি উপুড় হয়ে পড়ে কাঁদছে।

মা অনেক সময় চিঠিপত্রের মাধ্যমেও স্বাস্থ্যবিষয়ক নির্দেশ দিতেন, তা যথাস্থানে উল্লিখিত হয়েছে। মা আমাদের বলতেন ভাতের চেয়ে রুটি বেশি খেতে, কারণ গমে শক্তি বেশি। বলতেন, "ছানা খেতে পারিস্ না? দই দিয়ে ছানা করে টমেটোর রস দিয়ে খাবি। ছানার সন্দেশ করে খাবি।" যে সব ছোট ছোট মেয়েরা দুধ খেতে চাইত না, তাদের জন্য মা বলতেন ছানা, দই, সন্দেশ, আর যদি পেট ভাল থাকে, তবে রাবড়ি, পায়েস ইত্যাদি করে দিতে। দ্রুত শক্তি সঞ্চয়ের জন্য দুধ, ফলের রস ও কাঁচা টমেটোর রস খোসা ও বিচি ফেলে, অর্থাৎ ছেঁকে নিয়ে, খেতে বলতেন। কী করে ধীরে ধীরে গভীরভাবে শ্বাস নিতে ও ছাড়তে হয় নিজে আমাদের শিখিয়ে দিতেন। দু'চারটি হাল্‌কা ব্যায়াম করতে বলতেন। চিকিৎসাধীন অবস্থায় ডাক্তারের আদেশ পালন করতে বলতেন।

১৯৭৬ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর

দিল্লীতে মার কাছে রাত্রে দেখা করতে গিয়েছি। প্রতিদিন রাত্রে মার শয়নের পূর্ব্বে মাকে প্রণাম করতে যাই। মা আমাকে দেখেই জিজ্ঞাসা করলেন, "কাজল কেমন আছে? ওর এক্সরে হবে, এই শরীর ৬ মাস আগে উড়প্পাকে দেখাতে বলেছিল কিন্তু কেউ শুনল না, মেয়েটাকে দেখাল না। এখন দিন দিন বেড়ে গেল।"

কাজল কন্যাপীঠের একটি মেয়ে। মাকে আমি কাজলের খবর দিয়েছিলাম, তাই মা টেলিগ্রাম করে তাকে দিল্লীতে নিয়ে এসেছিলেন এবং ডাঃ দুর্গাদাসকে দেখিয়েছিলেন। ভাল চিকিৎসার ব্যবস্থা করে-ছিলেন।

কোন মেয়ে অসুস্থ হলেই মা তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছেন। মায়ের চিকিৎসার ত্রুটি ছিল না।

★

ছয়

সাধারণে অসাধারণ

ছয়

সাধারণে অসাধারণ

মায়ের মধুঝরা ব্যবহারের দৈনন্দিন ছোট্ট ছোট্ট দিক্ অন্ততঃ দু'চারটি উল্লেখ না করলে মায়ের কথা লেখার এ চেষ্টা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। মহামহিমামণ্ডিতা মাকে আমরা খুব কাছের মানুষ রূপে, বন্ধু রূপে দেখেছি, কাছে পেয়েছি। তিনি কখনও আমাদের সঙ্গে খেলা করেছেন, কখনও আমাদের পরিবেশন করে খাইয়েছেন, কখনও সাধ করে আমাদের হাতের রান্না খেয়ে তারিফ করেছেন, আমাদের কত জায়গায় বেড়াতে নিয়ে গেছেন। নিজে গান গেয়ে আমাদের দিয়ে গান গাইয়েছেন, আমাদের সঙ্গে নাটক করেছেন। কত বলব! সবই মধুময়।

মা এসে উপস্থিত হলে যারা তাঁকে গেটের কাছেই ঘিরে ধরত, তাদের প্রত্যেককে জিজ্ঞেস্ করতেন, "কেমন আছ?" আশ্রমের সমস্ত দেবদেবীর মন্দিরে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে "আলাপ" সেরে আবার বাকি সবাইকার খোঁজ খবর নিতেন, বিশেষ করে রুগ্ন ও বৃদ্ধবৃদ্ধাদের। আবার বিদায় নেবার সময়ও সবার নাম নিয়ে নিয়ে বিদায় নিতেন। ডায়েরী থেকে একটি উদাহরণ—

১৯৭৬ সালের ৫ই জানুয়ারী

আজ মা কাশী থেকে নৈমিষারণ্য যাত্রা করলেন। রওনা হওয়ার সময় মা বললেন, "আসি দিদি, আসি বেলু, আসি গীতা, আসি গৌরী", ইত্যাদি।

আমরা অনুভব করতাম মা আমাদের কত আপন, মায়ের কোন ভেদবুদ্ধি নেই।

১৯৭৬ সনের ৩০শে মে

কনখল। আজ বিকালে মা শেঠানীর বাগানে লিচু পাড়তে গেলেন। আমরা এবং ছেলেরা মায়ের সঙ্গে গেলাম। মা প্রথমে গাছকে ফুল, চন্দন ও মালা দিলেন। তারপর মা আমাদের বললেন একটা করে লিচু পাড়তে। অবশেষে মা লিচু পেড়ে আমাদের সকলকে অনেক লিচু দিলেন।

আপাতদৃষ্টিতে খুবই সাধারণ ঘটনা। কিন্তু মনে হয় এর মধ্য থেকেও শেখার অনেক কিছু আছে। বৃক্ষ ফলদান করে। ফলদানেই তার সার্থকতা। কিন্তু লোভে পড়ে যেমন তেমন ভাবে ফল পেড়ে খেলে গাছকে অসম্মান করা হয়। প্রতিটি বৃক্ষলতা জীবন্ত ; তারা আমাদের প্রতিবাসী, উপকারী বন্ধু। তাদেরও উপযুক্ত প্রীতি ও সম্মান দিতে হবে। লিচু গাছ কিছু পবিত্র বৃক্ষের কোটিতে পড়ে না। তবু লিচু পাড়ার আগে তাকে ফুল মালা চন্দন ভূষিত করে মা তার অধিষ্ঠাতা অন্তরাত্মাকে সাদর সম্ভাষণ করলেন। গাছের সঙ্গে আমাদের আলাপ-পরিচয় হল। যেন তারই সানন্দ অনুমতি নিয়ে আমরা একটি-একটি করে লিচু পাড়লাম। ছোট ছেলেমেয়েরা গাছ থেকে ফল পেড়ে খেতে ভালবাসে। তাই মা আমাদের সাধ পূরণ করলেন। কিন্তু বললেন মাত্র একটি করে পাড়তে। অর্থাৎ যেন সংযমের অভাব না ঘটে। যথেচ্ছ ভাবে পাড়তে বললে আমাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যেত, আর বিশৃঙ্খলা ঘটত। অবশ্য আমাদের সংযমের সুফল পেলাম হাতে-হাতে—মায়ের হাত থেকে প্রচুর লিচু লাভ হল !

১৯৭৫ সালের ডিসেম্বর মাসে মা কাশীধামে। রাত্রিবেলায় মা আহার শেষে এসে বসেছেন। আমরা মায়ের কাছে বসে আছি। আমাকে দেখে মা বললেন, "কি গো, কেমন আছ ?" ছ'বার জিজ্ঞাসা করলেন। আমি বললাম, "ভালো।" মা বললেন, "আজ রান্না কে করেছিল ?" বেলুদি বললেন, "জয়া।" মা বললেন, "খুব ভাল

খেয়েছি।" তারপর বললেন, "মূলা বড় বড় করে কেটে কম আগুণে ছেঁচকি বসাবি। সকলের হাতের রান্না ভাল, তবে তুলসীর হাতের আলাদা স্বাদ। তোমরা পড়াতে এম্, এ, পাশ করেছ, আর তুলসী রান্নাতে এম্, এ, পাশ করেছে।"

একদিন রাত্রে মা দাদাভাইকে বললেন, "দিদি, তুমি আজ আমার জন্য রান্না কর। কি কি করবে, বল।"

দাদাভাই বললেন, "কফি বেগুণ চচ্চড়ি, ছানার ডালনা, মরিচ ঝোল," ইত্যাদি।

মা অনেকদিন পর দাদাভাইয়ের হাতের রান্না খেলেন। মা বললেন, "এ রকম স্বাদ কারও হাতে হয় না।" আমাদের সকলকে মা রসগোল্লা পরিবেশন করলেন।

মা যখন রান্নার ফরমাস করতেন, তখন আমাদের উৎসাহ শতগুণে বর্ধিত হত। খুব আনন্দ হত। মনে হত জীবন সার্থক। কত সময় দেখেছি মা বসে বসে শাক বাছছেন। একটি একটি করে শাক তুলে কি সুন্দর ভাবে বাছতেন। তাতেই কত মাধুর্য। মা আমাদের হাত ধরে শাক বাছা শিখিয়েছিলেন, কিন্তু আমরা মায়ের মতন অমন নিখুঁত ভাবে বাছতে পারতাম না।

১৯৮২ সালের ২০শে জানুয়ারী—এলাহাবাদে কুম্ভমেলা

দুপুরে মায়ের ভোগের পর প্রভুদত্তজী এলেন। উনি একটা বেল এনে মাকে বল্লেন, "ম্যাঁয় জহাঁ পূজা করতা হুঁ ওহাঁ এক বেলকা পেড় হ্যায়, উসমেসে ম্যাঁয় এক লায়া হুঁ।" মা বল্লেন, "দো বাবা, ম্যায় তো রোজ খাতী হুঁ, এক দফা বাবা নে দিখায়া থা, ম্যায়নে দেখা হ্যায়, মুঝে ইয়াদ হ্যায়।" প্রভুদত্তজী বল্লেন, "মা, ম্যায় মন্ত্র পড়কর দুংগা।" এই বলে মন্ত্র পড়ে বেলটি ধুয়ে ভেঙ্গে, চামচে করে মায়ের মুখে দিলেন। মা খেয়ে বল্লেন, "বহুত মীঠা হ্যায় বাবা, থোড়া সা

তোড়ো, ম্যায় থোড়া থোড়া খাউঙ্গী, বাবা, তুমনে কহা থা সব কিস্মকা থোড়া থোড়া খানে কে লিয়ে, আউর খানা দেখনেসে রুচি হোগা, ইসলিয়ে ম্যায় আজ থোড়া খায়া, তুম্হারা বাতকা খ্যাল আয়া।” প্রভুদত্তজী বল্লেন, “হঁা, মা, থোড়া থোড়া খাও অচ্ছা হো জাও।”

মা—“বাবা নে তো ইস শরীর কো ক্যাম্প মে রহনা শিখায়া।”

মা বেল খেতে খেতে বল্লেন, “বাবা বহুত থোড়া দেনা, অভী খানা খায়া, উল্‌টী হো জায়গা।” মাকে বেল খাইয়ে যা ছিল সেটা প্রভুদত্তজী নিজের মুখে দিলেন।

আমরা দেখে আশ্চর্য্য হলাম মার প্রতি কত গভীর ভালবাসা, মা সাধুদের সর্বদা সম্মান করতেন। প্রভুদত্তজীর সম্মান রাখতে মা তাঁর খাওয়া হয়ে যাবার পরও বেল গ্রহণ করলেন।

১৯৮১ সালের ৮ই জুন

দেরাদুনে মা রাজা বেনের বাড়ীতে আছেন। জামাই ষষ্ঠীর দিন। সকালে মামীমা মাকে ধান দূর্বা নূতন কাপড় দিয়ে পূজা করলেন। ছবিদি চন্দনদিও মাকে পূজা করলেন। দেরী হচ্ছিল দেখে মা মামীমাকে বল্লেন, “তোমরা জান না সময় যে চলে যাচ্ছে”। মামীমার সন্তানদিগের ষষ্ঠীকৃত্য বাকী ছিল।” মামীমার মেয়ে বুলুকে মা বল্লেন, “তোর ছেলেকে খেতে দে, ধান দূর্বা দে, খেতে দিয়ে বল যে খাও। জল দে। ষাট্ ষাট্ বল।” বুলু ঠিকমত কিছুই করে নাই দেখে মা বল্লেন, “ওরা আধা নিয়ম করে, কিছু জানে না তো, ওদের কেউ শেখায় নি তো।”

তারপর মা আমাদের সকলকে পাখার বাতাস দিলেন। মাথায় ধানদূর্বা দিলেন, হাতে ফল দিলেন, ষাট্, ষাট্ বল্লেন। তারপর আবার বল্লেন, “এই শরীরের মা পিঁড়ি পেতে বসিয়ে পূজার মত সব করত।” মার হাতে সকলে মঙ্গলসূত্র বাঁধল।

আমার মনে খুব আনন্দ হল। মনে হল আমার মাও আমাকে এরকম হাওয়া দিতেন, মায়ের স্নেহ আদর ভুলবার নয়।

•

১৯৮০ সালের ১৬ই মার্চ

আমরা মার সঙ্গে দেখা করতে বিন্ধ্যাচলে গিয়েছি। পুষ্পদি, বীথুদি, পটলদা আর প্রেমাজী সঙ্গে ছিলেন। মা গোপাল ঠাকুরের মেয়ের সঙ্গে কথা বলছিলেন। মা বললেন, "এ শরীরের তো কোন বন্ধন নাই, যখন হয় যাওয়া হবে।" আমরা মাকে প্রণাম করতেই মা সকলকে পৃথকভাবে শারীরিক কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। এলাহাবাদ থেকে নিরীক্ষক মহোদয় কন্যাপীঠে এসেছিলেন, মেয়েদের দেখে খুসী হয়েছেন, তবে মেয়েরা সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে নাই। মা শুনে বললেন, "মেয়েদের প্রশংসা করে গেছে তো? সব ঠিক ছিল তো?" সকলের সাথে কথা বললেন। মা হঠাৎ আমাকে ডেকে বললেন, "তুই খাজা বানাতে জানিস্? একটু খাজা বানিয়ে দে, এখান থেকে ঘি ময়দা সব জিনিষ নিয়ে যা, তুই খেয়ে দেয়ে খাজা বানা।" পারুলদিকে সব জোগাড় করে দিতে বললেন। বিকালে মার বিশ্রামের পর খাজা বানিয়ে মাকে দেখালাম। মা শুয়ে ছিলেন। পারুলদিকে বললেন, "আমাকে উঠা।" মা বসে দেখলেন এবং টিফিন ক্যারিয়ারে ভরলেন। একটা খাজা রেখে বললেন, "তোরা সকলে এটা থেকে নিস্, কেমন বানিয়েছিস্, খেয়ে দেখবি।" তারপর সকলকে একটু একটু করে ভেঙ্গে দিলাম। মা সকলকে জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন হয়েছে। সকলে ভাল বলল। মা আবার নিমকিও করতে বললেন তবে অন্য দিদিকে। কারণ আমি সন্ধ্যাতেই কাশী ফিরে আসব। মা বললেন, "জয়া এল ওকে দিয়ে কাজ করালাম। এটা নীচে (বেলুদির কাছে) পাঠিয়েছিলাম কিন্তু হল না। কে জানে ও আসবে (আমাকে দেখিয়ে) আর বানাবে। এ শরীরের তো এরকমই কাজ হয়।" মা খুব প্রসন্ন হলেন।

বীথু দি মাকে বললেন, "খুব তাড়াতাড়ি বানাল তো।"

মা বললেন, "অন্নকূটে বানিয়ে অভ্যাস হয়ে গেছে।"

মা আমার মাথা ও পীঠে হাত দিলেন। আমার মনে হল আমি মিষ্টি বানাবার জন্যই যেন মায়ের কাছে গিয়েছিলাম। মার শরীর খুব খারাপ ছিল তবুও মা কৃপা করে আমাদের সঙ্গে কথা বললেন।

মায়ের কাজ যে করতে পারলাম সেজন্য নিজেকে ধন্য মনে হল। মায়ের কাজ এমনই হয়, আমরা বুঝি না।

মা কোন জিনিষ আমাদের কাছ থেকে চাইলে খুব সাবধানে বলতেন। মায়ের কথাতে মনে হত মা কত সঙ্কোচ করছেন আমাদের সঙ্গে। একদিন রাত্রে মা জিজ্ঞাসা করলেন, "কে রে এখানে?" আমি বললাম, "জয়া।" মা বললেন, "একটা কম্বল দিতে পারবে আমাকে?"

আমি—"মা, নূতন কি পুরাণ?"

মা—"নূতন দিতে পারবি? তা হ'লে নিয়ে আয়। দাস্থকে ডাক্।"

আমি মাকে কম্বল এনে দিলাম। মা বললেন, "আর লাগবে না, দাস্থ দিয়ে দিয়েছে।"

১৯৭৭ সনের ১লা জানুয়ারী

মাকে দেখেছি মা সর্বদা ভক্তের ইচ্ছা পূর্ণ করেন। মায়ের কাছে যে যা জিনিষ চায় মা দিয়ে দেন। কিন্তু মাকে নিজের ব্যবহৃত পাদুকা কখনও দিতে দেখি নাই।

একবার মা জনৈক ভক্তকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি পেয়েছ?"

সে বলল, "না মা, উদাসজী দেয় নাই।"

মা মৈত্রেয়ীজীকে পাদুকা দিতে বললেন।

মা—"এ শরীর কিন্তু এসব দেয় না, কাউকে বলো না মা দিয়েছেন। এ শরীর জামা কাপড় দেয়।"

আমি দেখে আশ্চর্য হলাম। তার কি ভাগ্য যে মায়ের পাদুকা মা নিজেই তাকে প্রদান করলেন।

১৯৭৭ সনের ৩১শে মার্চ্চ

মনে পড়ে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের কুলপতি মায়ের কাছে পাদুকা চেয়েছেন। মা তাঁর সাথে অনেকক্ষণ কথা বললেন। দাদাভাই এর ঘরে মা ছিলেন।

মা বললেন—"এটা দিদির ঘর। দিদি এসব সাজিয়েছে (মার ফটো এবং পাদুকা দেখিয়ে) আমার বিশ্রামের জন্য এইটুকু জায়গা ছেড়ে দিয়েছে, আমি দিনে এইখানে থাকি।"

দাদাভাই—"এত কষ্ট করে আশ্রম বানানো হয়েছে, এখানে মা থাকেন না।"

মা—"সব জায়গায় বারান্দায় শুই, এখানে আশ্রমে শুই না, কোন কারণে অন্য জায়গায় শুই।"

কথাবার্ত্তার পর কুলপতি মহাশয়কে মায়ের খড়ম দেওয়া হল। উনি এত খুসী হলেন যে বার বার প্রণাম করলেন আর বললেন, "আমার এত ভাগ্য যে আজ এত বড় জিনিষ আমি পেলাম।" ওনার স্ত্রীও খুব খুসী হলেন। যাবার সময় বললেন, "আমার জীবনে আমি এত বড় পুরস্কার পাই নাই।"

১৯৭৭ সনের ২রা এপ্রিল

মায়ের প্রতি জিনিষের যত্ন ছিল। মা আমাকে ডেকে একটা গালিচা দিয়ে বললেন, "এর ভিতরে তামাক পাতা, ন্যাপথলিন দিয়ে, কাপড় দিয়ে রোল করে তার খাপ বানিয়ে ভাল করে রাখবে। ইঁদুরে না কাটে, এখন কোথায় রাখবে?"

আমি—"মা, গুহাতে রাখব, সেখানে ইঁদুর যায় না।"

মা—"সেখানে একটাও ইঁদুর নাই ?"

আমি—"না, সেখানে অনেক জিনিষ থাকে। টিন দিয়ে দরজা বন্ধ করা আছে।"

ছোট ছোট জিনিষও মা কত যত্ন সহকারে রাখতে শেখাতেন, তা বর্ণনাতীত।

মায়ের চিঠি

মায়ের চিঠি

"ভগবানকে প্রাণের আবেদন-নিবেদন জানান। ভগবানকেই স্মরণ। মনে প্রাণে ইষ্টজপ চেষ্টা। ... ঋষিপন্থা বলা হয়। ঋষি ক্ষেত্রও বলে। বৈধ ভোগ ও বিধিপূর্বক ভোগ মানে শাস্ত্রীয় বিধি। সর্বাবস্থায় ভগবানকে স্মরণ।"

★ ★ ★

"ভগবানের কৃপা-প্রার্থনা হওয়া, আর নিজস্ব জন মিলিত হইয়া যাহা নিজের কর্তব্য বলিয়া মনে হয়, ভগবান যাহা করান, তাহাই করা। ভগবৎ স্মরণ। গুরু-আদেশ পালন।

ভগবান যাহা করান, উপস্থিত তাহাই করা। .. প্রাণের নিবেদন ভগবানকে জানান, সর্বক্ষণ।"

★ ★ ★

"কালীপূজা ভালভাবে হ'য়ে গেছে ;— এই ছোট্ট মেয়েটাও ঐ কালীপূজায় ছিল উত্তরকাশীতে মনে রাখা। কৃপা প্রার্থনা সকলেরই হওয়া। সেই ভগবানকে স্মরণ। তাহাতেই প্রাপ্তি-যাত্রা।"

★ ★ ★

"সত্যানুসন্ধানের যাত্রী হওয়ার চেষ্টা মানুষেরই কর্তব্য। সর্বপরিস্থিতিতে তাঁহাকেই তো স্মরণ মানুষের হওয়া।"

★ ★ ★

"ভগবান যাহা করান ;ভগবানের কাছেই প্রাণের প্রার্থনা জানান। সৎ পরিবেশে মন রাখা।"

★ ★ ★

"ভগবানের রাজ্যে কী কর্ম করলে কী করেন, মানুষের জানা নাই। তাঁর বিধান সব কাজে ও ভাবের ভিতরে। তাঁহাকেই স্মরণ, শান্তির দিক্ নেওয়া।"

★ ★ ★

"দীক্ষা নিয়েছ, খুব ভাল করেছ। খুব জপ ধ্যান করা। নিত্য ব্রতী থাকা।"

★ ★ ★

জনৈক ভক্তের দুঃখ নিবেদনের উত্তরে—"তোমার অসীম দুঃখের কথা যে শুনে তারই মন খারাপ লাগে। কী করা! ভগবানের বিধান—এই দুর্ভোগ—কষ্ট সহ্য করতে হচ্ছে। সর্বদা ভগবানকে স্মরণ!"

★ ★ ★

"ভগবানের কৃপা প্রার্থনা। ভাল চিকিৎসা করা।"

★ ★ ★

"নিজেদের সারাদিনের প্রোগ্রাম বুঝিয়া ধ্যানের, মৌনের সময় ঠিক করিয়া নেওয়া। সত্যানুসন্ধান মানুষের কর্তব্য। সর্বদা ভগবানকে স্মরণ।"

★ ★ ★

"নিজেদের যথাশক্তি চিকিৎসা করা। ভগবানকে স্মরণ। প্রাণের আবেদন ভগবানকে জানান। এত অসুস্থতার দিক্ কিন্তু ভাল না। ভালমত চিকিৎসা হওয়া।"

★ ★ ★

"জপ. ধ্যান, স্মরণ, পাঠে যত বেশী মন রাখা। ভিতরে শক্তি উৎপন্ন হওয়ার রাস্তা খোলা।"

★ ★ ★

"ভগবানের দিকে মন রাখার জন্য অনুকূল ক্রিয়ায় সর্বক্ষণ থাকার চেষ্টা।"

★ ★ ★

"পরমার্থ-পরিবেশে মন রাখা।"

★ ★ ★

"ভাল চিকিৎসা হওয়া। সুনিদ্রায় পেট ও স্বাস্থ্য ভাল রাখা। ভগবৎ চরণে মন রাখা।"

★ ★ ★

"নিয়মিত জপ ধ্যান করিয়া যাওয়া। যে-কোন পরিস্থিতি দেন—তাঁর পূজায় যেন ত্রুটি না হয়।"

★ ★ ★

"ভগবৎ পথের যাত্রায়ই শান্তির দিক্। সেই যাত্রায় মানুষের ব্রতী থাকা।"

★ ★ ★

"পরীক্ষায় ভয় করতে নাই। ব্যক্তিত্বের সঙ্গে পড়া। সব সময় ভগবানকে স্মরণ।"

★ ★ ★

"নিজ কর্তব্য পালন। ত্রুটিহীন চেষ্টা। সত্যানুসন্ধানে মন রাখা। পরমার্থ ভাব নিয়ে সর্ব ক্রিয়ায় ব্রতী থাকার চেষ্টা।"

★ ★ ★

"নিত্য সন্ধ্যাক্রিয়া করাই—যতক্ষণ জ্ঞান থাকিবে ততক্ষণ। বেশী জপ করিতে না পারিলে কী করা!"

★ ★ ★

"ভাল পড়িলে ভাল পাশ। ভগবান যাহার জন্য যাহা করেন তাহাই মঙ্গল। সর্বক্ষণ মনে রাখা।"

★ ★ ★

"ভগবৎ প্রাপ্তি লক্ষ্যে ঠিক ঠিক যাত্রা যদি হয়' তিনিই যোগাযোগ করিয়ে দেন। সত্যানুসন্ধানে মানুষের যাত্রা হওয়া।"

★ ★ ★

আশা-ভরসা-প্রার্থনা সবই ভগবানের কাছে হওয়া। পাওয়ার ইচ্ছা

যাহা—ভগবানকেই সর্ব পরিস্থিতিতে স্মরণ। তাঁকে পাওয়ার ইচ্ছা। তাঁকে না হলে চলে না, এইটাই আসা প্রয়োজন। প্রাণের আবেদন-নিবেদন ভগবানকে জানান।"

★ ★ ★

"ভগবানের বিধানে সব কিছু আসা-যাওয়া। পরিজনের বিয়োগ-দুঃখ স্বাভাবিক। ধৈর্য্যের আশ্রয়ে অন্তিম কর্ম ধর্ম পরিবেশে করা। সব পরিস্থিতিতে ভগবৎ স্মরণ। নিজেই নিজেকে সান্ত্বনা দেওয়া।"

★ ★ ★

"ভগবান সব সময় একভাবে রাখেন না, তবু ভগবৎ চিন্তায় মনকে একভাবে রাখা মানুষের কর্তব্য। প্রাণের প্রার্থনা তাঁকেই জানান। ধর্মবুদ্ধিতে গৃহস্থাশ্রমের সেবা করা।"

★ ★ ★

"সংসারযাত্রায় নানারকম ক্লেশ। ধৈর্যের আশ্রয় নিয়ে ভগবৎ চিন্তন হওয়ার চেষ্টা। ভগবৎ চিন্তন বিনা শান্তির কোন দিক্ নেই। ভগবানের আশ্রয়ে শান্তির আশা।"

★ ★ ★

জনৈকের অসুস্থতার সংবাদে—

"অসুস্থতা তো ভোগ করেই আসছে। ভাল চিকিৎসা, নিয়মিত আহার-নিদ্রায় সুস্থ রাখার চেষ্টা। পরমার্থ চিন্তায় মন রাখা।"

★ ★ ★

"ভগবানের কাছে হৃদয়ের প্রার্থনা জানান। নিজ লক্ষ্য প্রাপ্তি-যাত্রায় নিত্য ব্রতী থাকা।"

★ ★ ★

"গুরু-উপদেশ পালন। প্রাণে মনে যা আসে গুরুকে জানান। ভগবানই পিতা, মাতা, বন্ধু, সখা সব।"

★ ★ ★

"সব সময় ভগবানের কৃপা প্রার্থনা। যাঁহার সৃষ্টি তাঁহাকেই প্রাণের নিবেদন জানান। নিত্য ভগবানকে স্মরণ।"

★ ★ ★

"ভগবানের চরণ স্মরণ সর্বক্ষণ মানুষের চেষ্টা। ভগবান্ আশ্রয় দেন, তাঁকে পাবার জন্য যাত্রায় ব্রতী থাকা।"

★ ★ ★

"দেবপূজায় ব্রতী—আনন্দ। নিত্য ইষ্টপূজায় ব্রতী থাকা। অখণ্ড স্মৃতি জাগরিত থাকাই মানুষের কর্তব্য।"

★ ★ ★

"সুস্থ শরীরে আত্মচিন্তায় ব্রতী থাকা।"

★ ★ ★

"সৎ আগ্রহেই কার্য সফল হওয়ার দিক্।"

★ ★ ★

"স্বপ্নে তো অনেক দেখা যায়। স্বপ্ন তো অলীক। কোন-কোন বিষয়ে অবশ্য জাগতিক স্বপ্ন সফল হয়।"

★ ★ ★

"মানুষ মাত্রই নিজ জীবনে সত্যানুসন্ধানে জয় লাভের চেষ্টা।"

★ ★ ★

জনৈক ভক্তের গৃহস্থাশ্রম-প্রবেশের পূর্বক্ষণে—

"পিতামাতার কর্তব্য সন্তানকে গৃহস্থ-আশ্রমে ঋষিপন্থায় প্রবেশ করান।"

★ ★ ★

"ভগবানের দিকে অগ্রসরের ক্রিয়া। ভগবানকে স্মরণ, সদা ভগবানের কৃপা প্রার্থনা।"

★ ★ ★

"ধর্মের সংসার হওয়া—যাহা কল্যাণ।"

* * *

"গীতা-ভাগবত সময় মত পড়া। ভগবানের কাছে প্রাণের প্রার্থনা সর্বক্ষণ করা। যে নাম পেয়েছ, সে নাম নিয়ে সব সময় তন্ময় হ'য়ে থাকার চেষ্টা।"

* * *

"চিকিৎসায় শরীর ভাল, তাই সর্বক্ষণ ভগবৎ-স্মরণের চেষ্টা।"

* * *

"সংসার যাত্রায় এই আসা-যাওয়া, অভাব জনিত ক্লেশ ভোগ। ভগবৎ স্মরণ সর্ব পরিস্থিতিতেই।"

* * *

গ্রহ শান্তির জন্য মাকে জিজ্ঞাসা করায় মা নিম্নলিখিত উত্তর লেখান ঃ—

"ভগবান যখন যোগাযোগ করবেন, খবর নেওয়া। ভগবান্ যা করান, করা। মা পাথর ধারণের বিষয় কিছু বলেন না তো! কাজেই কোন বিশেষ ব্যক্তির কাছে পাথর ধারণ জিজ্ঞাস্য। সব পরিস্থিতিতে ভগবানকে স্মরণ।"

* * *

দুঃস্বপ্ন দর্শন প্রসঙ্গে মায়ের উত্তর ঃ—

"নিজের স্বপ্নের কথা জল ও সূর্যের নিকট জানান। ভগবান যা করেন, তাই হয়। তাঁর নিকট প্রার্থনা হওয়া।"

* * *

ব্রহ্মচারিণী বাণীকে—

দেরাদুন, ৩০-৪-৭৭

"এ পথে তো আছই—সৎ চরিত্র, সৎ ভাবধারা নিয়ে মিষ্ট ভাব-ভাষায় সেবা হওয়া।"

* * *

দেরাদুন, ৩০-৪-৭৭

ব্রহ্মচারিণী গীতার পত্রের উত্তরে—

"নিশ্চয় ভাল পড়াশুনা করছো—ভাল ফল তো হওয়াই। উপস্থিত আশ্রমের যোগ্য মেয়ে তো আছেই। আরো বিশেষ রূপ—সত্যানুন্ধান, সৎ চরিত্র স্বভাব অক্ষুন্ন রাখার চেষ্টা তো করছ, করবেই। মিষ্ট ভাব-ভাষা হওয়া।"

* * *

৭-৫-৭৭

ব্রহ্মচারিণী গীতাকে লেখা—

"... ... বুদ্ধিমতী, — সবটা করছে, করবে। নিজেদের আশ্রম, সবটাই তো করা। নিজের সৎভাব, ব্যক্তিত্ব, সত্যানুসন্ধান—সর্বক্ষণ। মন প্রাণ দিয়ে কেবল নিজেকে জানার দিক্। নিজেকে জানলে ভগবানকে জানা, ভগবানকে জানলে নিজেকে জানা।"

* * *

নৈমিষারণ্য, ৩-৮-৭৮

ব্রহ্মচারিণী জয়ার চিঠির উত্তরে—

"মেয়েরা ভাল পাশ করেছে—আনন্দ। ভগবৎ সেবায় ব্রতী থাকা।"

* * *

২২-৮-৬৭

"জয়া এই শরীর নিয়া ভাল পাশ করিয়াছে আনন্দের কথা। শরীর সুস্থ রাখা, ভাল পড়া—সব দিকের পাশ। চরিত্রবল মহাবল। সত্য কথা বলা, মণ্ডলী না করা, নির্বিচারে গুরুজনের আদেশ পালন। কাহারও সঙ্গে প্রাইভেট কথা না বলা। সকলকেই এই কথা শিখাবে। নিজেও ত পালন করাই। ... এমনভাবে এদিকটা পালন করিবে, যেন আদর্শ হইতে পার। 'জয়া' নাম—এ দিকটা জয়যুক্ত হউক্। আনন্দ-শান্তভাবে সকলের সাথে ব্যবহার রাখা।"

* * *

২৬-৪-৬৪

কন্যাপীঠের মেয়েদের চিঠির উত্তরে—

"ভাল পড়লে ভাল পাশ। জপ-ধ্যান-সৎসঙ্গে সর্বদা মন রাখা। সত্য কথা বলা। বড়দের মুখে-মুখে জবাব না দেওয়া। বড়দের দিকে চোখের দিকে তাকিয়ে কাহারও উপর রাগ না করা। নিজের ভিতরে রাগ প্রকাশ না হয়, চেষ্টা করা। সর্বদা শান্ত থাকা। কারুর সঙ্গে কেউ privately কথা বল্লে, diaryতে লিখে রাখা। ভগবান সর্বত্র মনে রাখা।"

* * *

"যাদের যে পথে যে স্থিতিতে থাকা হয়, তাদের সেই স্থিতি অনুযায়ী সব ক্রিয়া হওয়ার চেষ্টা করা।"

* * *

কুম্ভমেলা, ১৯৭৭ সন

"আকাশ গঙ্গা জল বর্ষণ করলেন। এই পিছল কর্দমাক্ত পথ পার হ'য়েই আমাদের ভগবানের পথে যেতে হবে। আমরা নিজে তো যেতে পারি না, যেতে চেষ্টাও করি না। তাই ভগবান আমাদের পথ দেখিয়ে দিলেন।"

* * *

ব্রহ্মচারিণী মালাকে—

"এই শরীরটার উপলক্ষ্যে আসিয়া এত কষ্ট, যে কষ্টের কথা লিখিয়াছে। এই শরীরটাকে বন্ধুরা যেন মাপ করে। ভাল চিকিৎসা, সৎ পরিবেশ—উপস্থিত যাহা লিখিয়াছ বড়ই আনন্দের কথা। শরীর সুস্থ ও মন ভাল হইলে যখন ইচ্ছা হইবে আশ্রমে আসিবে। আশ্রমের তো দরজা খোলা সকলের জন্য। সৎ সেবার অভাব। অনেক

খুঁজিয়াও ভাল লোক আজ অবধি পাওয়া গেল না, তাই মালা বন্ধুর এত কষ্ট। কেমন থাকে মাঝে মাঝে যেন চিঠি দেয়।"

* * *

"গীতা ভাগবত সময় মত পড়া, ভগবানের কাছে প্রাণের প্রার্থনা সর্বক্ষণ করা। যে নাম পেয়েছ, সে নাম নিয়ে সব সময় তন্ময় হয়ে থাকার চেষ্টা। চিকিৎসায় শরীর ভাল, তাই সর্বক্ষণ ভগবৎ স্মরণের চেষ্টা। সংসার যাত্রায় এই আসা যাওয়া, অভাব জনিত দুঃখ।"

* * *

১২-৫-৮০

ব্রহ্মচারিণী জয়াকে—

"সকালে ৪টা কমলার রস খাবে। সাড়ে আটটার সময় দুধ, সঙ্গে ডালিয়া খাবে, যতটা খেতে পার। দুপুরে যে সব সব্জী ডাক্তার তোমায় খেতে বলেছেন, সে সব সব্জী ছোট ছোট করে কেটে, তেলে পাঁচ ফোড়ন দিয়ে, সব্জীগুলো ঢেলে দেবে। গোল মরিচ আদা দেবে। জলের ছিটা দিয়ে ঢেকে দেবে। সিদ্ধ হলে নামাবে। টিণ্ডা, লাউ দিতে পার। যতটা রুটি ডাক্তার খেতে বলেছে, ততটাই খাবে। খাওয়ার পর মাঠা বা ঘোলের সরবত খাবে। বিকালে যদি ফল খেতে বলে দুই-তিনটার মধ্যে খাবে। রাত্রে বেশ করে সব্জীর জুস্ বানাবে, টিণ্ডা, লাউ ইত্যাদি সব্জী দিয়ে। ১টা মুসাম্বীর রস মিশিয়ে ডালিয়া দিয়ে খেয়ে নেবে। দুপুরে ২/১টা কমলা খেতে পার। মুসাম্বীর রসও একটু খেতে পার। ঘি, ভাত, আলু খাবে না। তাতে ফ্যাট কমবে। যখনই দুর্বল মনে হবে জল মিশিয়ে একটু দুধ খেয়ে নেবে। মিষ্টি নিষেধ থাকলে খাবে না। এইভাবে খেয়ে দেখতে পার, কেমন থাক। যার এ্যাপেণ্ডিক্স হ'য়েছে, তাকে খুব করে জল খেতে হয়।"

* * *

দেরাছুন, ১৭-৬-৮০

ব্রহ্মচারিণী গীতাকে লেখা—

"যখনই রাগ হয়, মনে মনে ঠাকুরকে স্মরণ করবে। ভাববে, এ তাঁরই এক রূপ। সর্বক্ষণ তাঁকেই স্মরণ-মনন। সর্ব দিক থেকে নিজেকে সংযত করার চেষ্টা। কাজে কর্মে তোমার সুনাম আছে, আরও যাতে সুন্দর হয়, সর্বক্ষণ সেই চেষ্টায় থাকা। গৌরীকে বলবে, নিজে সুস্থ আছি, এই চিন্তাই করা। পরীক্ষা দিতে পেরেছ, আনন্দ। ভাল খাওয়া-দাওয়া ক'রে নিজেকে সুস্থ রাখা। ভগবৎ চিন্তায় মগ্ন থাকা।"

* * *

কুচামন, ২৪-৮-৮০

ব্রহ্মচারিণী ইন্দু ও গৌরীর পাশের খবর শুনে মায়ের উত্তর—

"ভাল পাশ—সকলেরই আনন্দ। পরমার্থ দিকে আসল পাশের জন্য প্রস্তুতি প্রয়োজন।"

* * *

১৩-৮-৮০

ব্রহ্মচারিণী বাণীকে—

"নবরাত্রির সময়ে ঐ দর্শনের ভাবধারাটি নিয়ে নিত্য প্রণাম করবে। ইষ্টমন্ত্রতো সব সময় থাকেই, থাকবেই।"

* * *

মেয়েদের স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য মায়ের নির্দেশ

"করলা পাতার রস, কাঁচা হলুদের রস ও নিম পাতার রস একসঙ্গে মিশিয়ে খাইয়ে দেবে। ডাক্তার যা বলবেন, করবে। ডাক্তারের নির্দেশ মতো চলবে যথাশক্তি।"

* * *

ব্রহ্মচারিণী জয়াকে—

"মা কি কোন ঔষধ দেয়? ইচ্ছা হ'লে ১৫টা নিম পাতা শির ফেলে

একটু কাঁচা হলুদ দিয়ে বেটে নেবে। পরে জলে গুলে খেতে পার। ডাক্তারের ঔষধ তো খাওয়াই। ভালভাবে থাকা। ভগবানকে স্মরণ।"

❀ ❀ ❀

১৮-৪-৮১

নববর্ষে মায়ের বাণী—

"ভগবৎ প্রাপ্তি লক্ষ্যের যাত্রায় জীবন জয়যুক্ত হোক্।"

❀ ❀ ❀

কনখল, ২-৫-৮১

"সকলেই ভগবানকে স্মরণ চেষ্টা করা, করান—মনে রাখা।"

❀ ❀ ❀

নৈমিষারণ্য, ২১-৭-৮১

জনৈক ভক্তকে—

"ভগবান স্মরণ, জপ-ধ্যান, সৎসঙ্গ—যত সৎ পরিবেশে থাকা, ততই শান্তি পাওয়ার কথা। ভগবৎ ক্রিয়ার দিকে বিশেষ করে চললে শক্তির ও শান্ত হওয়ার আশা।"

❀ ❀ ❀

ব্রহ্মচারিণী গঙ্গার পত্রের উত্তরে—

"যজ্ঞেশ্বর যাহাদের প্রাণের ইচ্ছা সেবা গ্রহণ করিয়াছে—অনেকেরই আনন্দ। উপস্থিত শরীর কেমন? ডাক্তার কী বলেছে? মনপ্রাণ গুরু আদেশে মগ্ন থাকা।"

❀ ❀ ❀

নৈমিষারণ্য, ৩-৮-৮১

ব্রহ্মচারিণী কান্তিকে লেখা—

"নারায়ণ স্বামীজীকো সব বিধি পুছ লিয়া যায়। পদ্মা, বীথু, কান্তি, জয়া, গীতা, গুণীতা, গৌরী, গঙ্গা, বাণী—সব বড়ী লড়কিয়াঁ মিলকর হার্দিক ভাব সে যো আয় করে। উসী মুহূর্ত মে সব মিলকর

তো অচ্ছী তরহ সে সব কর লিয়া। কন্যাপীঠ কী লড়কিয়োঁনে আনন্দ হী নহীঁ কিয়া, উন লোগোঁ কা অনুভব ভী হুয়া। অপনে অন্তর মে যো প্রকাশ হোয়, করে।"

* * *

৯-১২-৬৬

মধ্যপ্রদেশের গভর্নরকে তাঁর কন্যার বিবাহে লেখা—

"পিতামাতা কা পুত্রীকে প্রতি কর্তব্য পালন – কন্যাদান—আনন্দ। গৃহস্থাশ্রম—জহাঁ শ্রম নহীঁ, ওহী আশ্রম। ঋষি পন্থা—ধর্ম কা সংসার হোনা।"

* * *

জনৈক ভক্তকে—

"ধৈর্য ধরিয়া ভগবৎজ্ঞানে সেবা করা। কর্তব্য করিয়া যাও। সংসারের রূপই এই—এক এক জনার কাছে এক এক রূপ। কাজেই তুমি ভগবান জ্ঞানে সকলের সেবা কর। যে কর্তব্যের মধ্যে পড়িয়াছ, তাহা করিয়া যাও। ভগবৎ প্রাপ্তি বিনা শান্তি নাই। সংসারে কেহ কখনও পরম শান্তি পাইয়াছে কি? ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর, 'হে ঠাকুর, তুমি এই রূপে আমার কাছে আসিয়াছ, আমি যেন শান্ত মনে সেবা করিতে পারি।' এই চিঠি মন খারাপ হইলে বারবার পড়িও। সংসারে সুখের আশা করিতে নাই। ভগবান যাহা করান করিয়া যাওয়া। কর্মক্ষয়ের জন্য এই বিধান উপস্থিত পড়িয়াছে। যে খুশি মনে করিতে পারিবে, সেই জিতিয়া যায়। এইভাবে পলে-পলে, তিলে-তিলে কর্মক্ষয় হইয়া যাইতেছে, মনে করা। সৎচিন্তায় সৎভাবে কর্ম করিলেই আর দুঃখ কষ্টের কর্মসৃষ্টি হয় না, গত জন্মের কর্ম নষ্ট হয়। তিনি যে ভাবে যাহা করান—যে রূপে প্রকাশ হন।"

* * *

কোনও ভক্তের পরলোক গমনে—

"এত পুরাতন ভগবানের ভক্ত। আজ তাহার এইরূপ—ভগবানের চরণে। প্রিয়জনের দুঃখ স্বাভাবিক। ধৈর্যের আশ্রয়ে উপস্থিত অন্তিম ক্রিয়া সম্পন্ন নিশ্চয়ই হইয়াছে। প্রিয়জনের কর্তব্য ঊর্দ্ধগতি প্রার্থনা। ভগবৎ স্মরণ। নিজের মনকে নিজেই শান্ত রাখা।"

* * *

জনৈক ভক্তকে—

"তুমি পরম মাতা, পরম পিতা, পরম বন্ধু, সখা, স্বামী তো। কাজেই ভগবানের 'মাতা' অক্ষর রূপটিও তো অমৃতই।"

* * *

কোন এক ভক্তের প্রতি—

"নিষ্কাম ক্রিয়া সকলেরই হওয়া। ভগবান সর্বময়, জীব-কল্যাণার্থে, সৃষ্টি-অনুসারে তিনি এক-এক সম্প্রদায়, মত, পথ প্রকাশে আছেন। যার যে দিক্ ধারা, প্রাণের টান, সে পথেই তাঁকে পাওয়া। তাঁকে পাওয়া মানেই নিজেকে পাওয়া। কোথা থেকে আসা হইয়াছে, কোথায় যাওয়া হইবে, হইতেছে—সমগ্র যেখানে জ্ঞান স্বরূপে প্রকাশিত, স্বরূপ-জ্ঞান যখন, মুক্তি তখন। সাকার-সত্তা প্রাপ্তি লক্ষ্যে বৈষ্ণব সম্প্রদায়—লক্ষ্য-অনুসার তাঁহার সেই প্রকাশ। তাঁহার লক্ষ্যে সত্য লাভই।"

* * *

ব্রহ্মচারিণী গুণীতার পত্রের উত্তরে—

"সব তরহ সে মন কো ভগবানকে চরণোমে রখনে কো কোশিশ। যো পড়াই কর রহা, উসমে আপনে কো শান্ত ভাবসে স্থির বুদ্ধি সে কর রহা। মাঁ নে আউর কহা,—জো করতী হ্যায়, তারীফ কা কাম করতী হ্যায়। সব কোই কো বহুত অচ্ছা লাগতা হ্যায়। শরীর স্বস্থ রখনেসে সব কাম ঠীক হোতা হ্যায়। সব কাম ঈশ্বর কো মধ্য সে রখকর সদ্ ব্যব-হার, সৎ কথা, সব ক্রিয়ামে রহে। ইসী তরহ বিশেষ দৃষ্টি রখে।"

* * *

জনৈক ভক্তকে—

"রুটিন বেশ সুন্দর হয়েছে, রুটিন মতন চলা। রোজই একটু হাঁটবে। সর্ব ক্রিয়ার মধ্যে ভগবৎ ভাবটা রাখার চেষ্টা। ভগবানের হাতের যন্ত্র, যেমন চালাচ্ছেন চলছে। মনে মনে জপ—চলায়—হাতে ক্রিয়া। ভগবৎ ক্রিয়া শক্তিতেই মন মজবুত হয় মনে রাখা। ভগবৎ ক্রিয়ায় আদর্শ দিক্ হওয়া।"

২৫-১-৭১

পুণা থেকে মা লিখেছেন—

"তোমাদের মধ্যে যে-কোন মেয়ে সারা ভাগবত পাঠ করতে পারবে, এরূপ মেয়ে ৩০শে থেকে ভাগবত পাঠ আরম্ভ করবে। ইচ্ছা করলে ১ মাসেও শেষ করতে পার। খাওয়ার নিয়ম নাই। ভোগের প্রসাদ হলেই হয়। অন্ন গ্রহণের পর আর পাঠ করতে পারবে না।"

২৯-৯-৮০

দাদা ভাইয়ের বিষয়ে—

"বড় মেয়েদেরও—ছোট মেয়েদেরও একটা ছিল। একেবারে খালি করে গেল। যতদিন বিছানায় শুয়ে ছিল, ছিল তো! দিদির শরীর যাওয়ার কারণ দু'টি—প্রারব্ধ ও উপস্থিত ক্রিয়ার ফল। প্রারব্ধের ক্ষেত্রে এ শরীরের সাথে জন্মান্তরের সম্বন্ধ।"

★